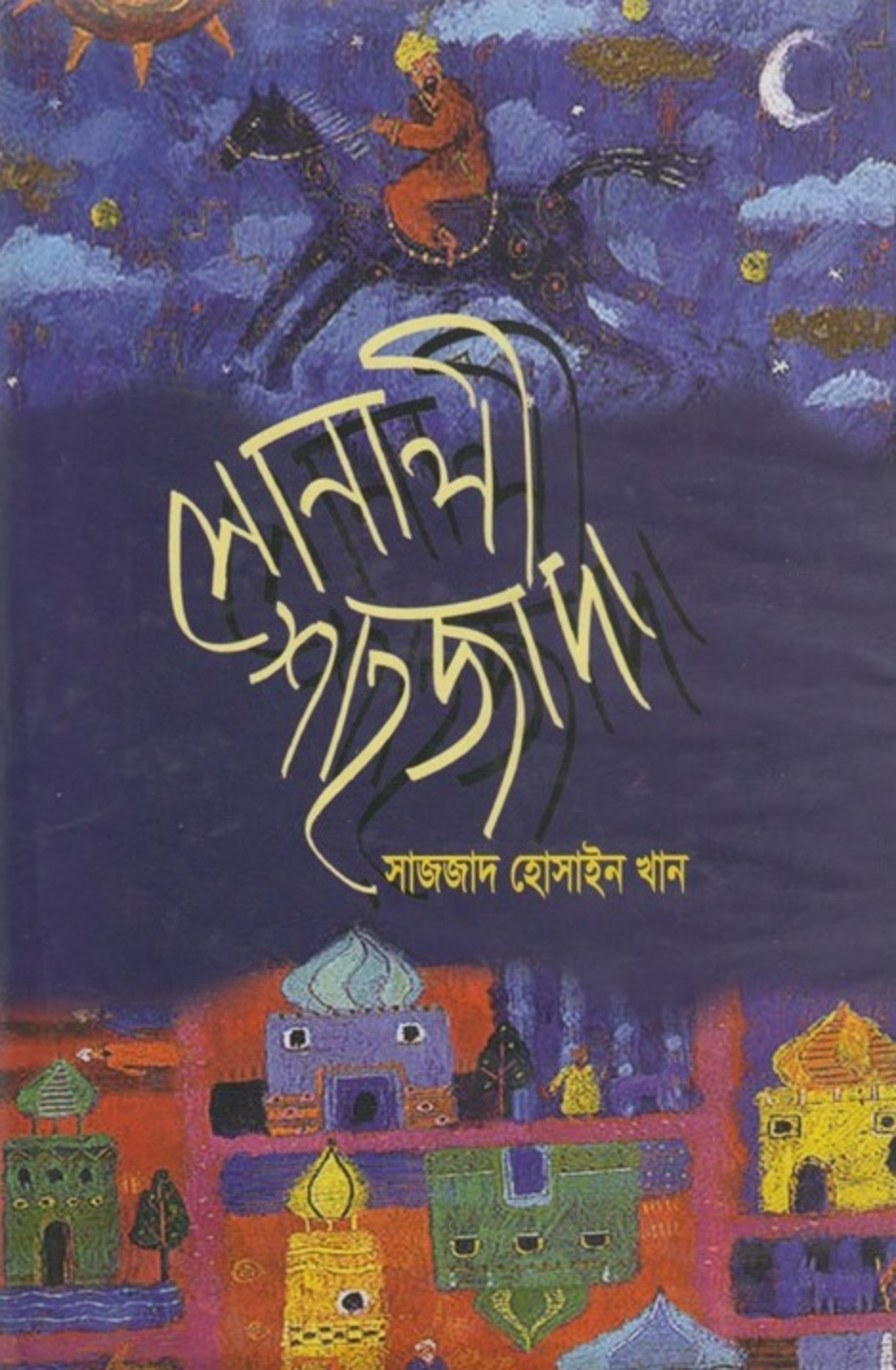

সোনালী শাহজাদা
সাজজাদ হোসাইন খান

সোনালী শাহজাদা

সাজজাদ হোসাইন খান

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

সোনালী শাহ্‌জাদা

সাজ্জাদ হোসাইন খান

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক প্রকাশনা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম- ৪০০০।

মোবাইল ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ- জুন ১৯৮১

সপ্তম সংস্করণ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

জানুয়ারী -২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

স্বত্বঃ মাহমুদা খান

প্রচ্ছদ ঃ মোমেন উদ্দিন খালেদ

মূল্য ঃ ২০০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SONALI SHAHZADA (Golden Prince : A Collection of Ideal Stories of Ideal Men from Muslim History): Written by Sajjad Hussain Khan Published by S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 200/- U$: 10/- **ISBN. -984-70241-0038-0**

www.pathagar.com

আব্বা আম্মা
যাদের বুকের নরম জেবে ভালবাসার নদী
আমার নামের গন্ধ মেখে বইছে নিরবধি

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ -এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে-শিশু-কিশোরসহ সকল শ্রেণীর পাঠকদের কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরা। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক জনাব সাজজাদ হোসাইন খান লিখিত **'সোনালী শাহ্জাদা'** শীর্ষক বইটি শিশু-কিশোরদের উপযোগী একটি জীবনালেখ্য সংকলন বই। তিনি তাঁর কুশলী কলমে আকর্ষণীয় ভাষায় গল্পের আঙ্গিকে কতিপয় মহান ব্যক্তির কিছু কিছু শিক্ষামূলক ঘটনা ফুটিয়ে তুলেছেন। শিশু-কিশোরদের কাছে এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই। তবে বড়রাও বইটি পাঠ করে উপকৃত হবেন। মহান ব্যক্তি-জীবনের অনন্য ঘটনা সকলের কাছেই আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম।

'সোনালী শাহ্জাদা' বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে। বইটি আল্লাহ্র রহমতে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। ইতিমধ্যে এর ছ'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সপ্তম সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জানাই অশেষ শুকরিয়া।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১.	সোনালী শাহজাদা	০৭
২.	অন্যরকম মানুষ	১৩
৩.	সত্যের সুবাতাস	১৮
৪.	মধুঝরা কণ্ঠ	২২
৫.	কুসমিত জোস্‌না	২৬
৬.	একজন রাজার গল্প	৩০
৭.	আঁধার কেটে আলো	৩৪
৮.	বিদ্রোহী ইমাম	৩৮
৯.	সাহসের রাঙা সুরুজ	৪২
১০.	অভিশাপের আগুন	৪৬
১১.	চম্পা ফুলের পাপড়ি	৬০
১২.	ঈমানের জোর	৭৩
১৩.	বিশ্বাসের লাল শিখা	৭৮
১৪.	ঢলের মতো গজব নামে	৮৭
১৫.	একটি মানিক জ্বলে	৯৫
১৬.	সোনারোদের ফুলঝুরি	১১৩

www.pathagar.com

জিয়ন কাঠি। ছোঁয়ালেই জেগে ওঠে সব। সোনার কাঠি রূপোর কাঠি অদল-বদল করলেই গোলাপ ফুলের পাপড়ির মতো চোখের পাতাগুলো কাঁপতে কাঁপতে খুলে যায়। বিরাট দীঘি। থই থই করে পানি। তার মাঝখানটায় সিন্দুক। তার ভিতর সোনার কৌটো। তারও ভিতর আছে ভোমরা। কুচকুচে কালো ভোমরা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে এক

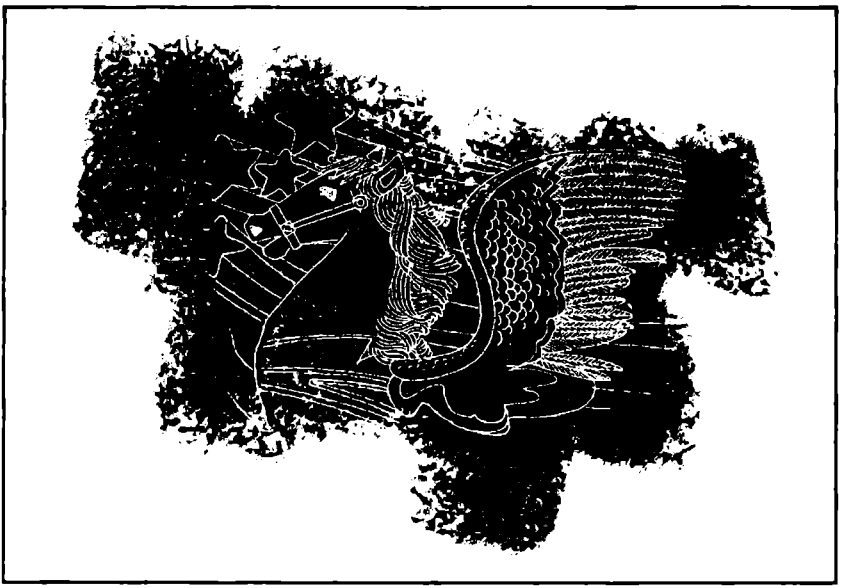

সোনালী শাহ্‌জাদা

ডুবে আনতে হয় সোনার কৌটা। তারপর দু'আঙ্গুলের মাঝখানটায় এনে শক্ত করে একটা চাপ দিলেই সব শেষ। দৈত্য-দানোবরা মরে যায়। রাক্ষস-খোক্ষসরা ভয়ে পালায়। নিঝুমপুরী গমগম করে। নহবতখানায় আবার নহবত বাজে। ঘোড়াশালে ঘোড়া জাগে। হাতীশালে হাতী জাগে। আরো জাগে পাখ-পাখালি, গাছের ডালে ডালে।

www.pathagar.com

ফুলে ফুলে প্রজাপতি, লাল-নীল-হলুদ। নিঝুমপুরীতে আলো জ্বলে। ঝলমল করে। ফক্ ফক্ করে। সেখানে এখন হাসি আর হাসি। আলো আর আলো।

এমনি করে দিন যায়। মাস যায়। বছরও চলে যায়। একদিন। নিঝুমপুরীর বাসিন্দারা বেখেয়াল হয় হাসতে হাসতে। আর রাক্ষস-খোক্ষসের ছেলেরা ভাবে, এই তো সুযোগ। এ সুযোগ হাতছাড়া করে না তারা। আবার আসে। নিঝুমপুরীর সব হাসি আবার থেমে যায়। আলো নিভে যায়। শুকসারি গান গায় না। পাখি নেই। প্রজাপতি নেই। খুশি নেই। আনন্দ নেই। সব উধাও হয় নিমিষে। সোনার কাঠি রূপোর কাঠি অদল-বদল করে দেয় তারা, আবার। আর অমনি সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। নিঝুমপুরী রাক্ষস-খোক্ষসের কব্জায় চলে যায়।

দিন যায়। মাস যায়। বছর যায়। অনেক বছর। নিঝুমপুরী আর জাগে না। হাসে না। দৈত্য-দানো আর রাক্ষস-খোক্ষসদের মনের ভিতর এখন খুশির ঢেউ। ওঠে আর নামে। তারা ধপ ধপ করে হাঁটে। মাটি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাঁটে। ঘর-বাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাঁটে। আনন্দে লুটোপুটি খায়। হৈ-হুল্লোড় করে।

অনেকদিন পর। অনেক বছর পর। পঙ্খীরাজে চড়ে আসে আর এক শাহ্জাদা। মেঘের পাহাড় ভেঙে ভেঙে। সাগর-নদী-বন কেটে কেটে। পুরীর চূড়ায় এসে থামে তার পঙ্খীরাজ। খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নেয় শাহ্জাদা। ব্যাপার দেখে সরদার দৈত্যটার চোখ বড় হয়ে যায়। আর অন্য দৈত্যগুলো ভয়ে পুকুরের ঢেউয়ের মতো কাঁপতে থাকে। তবু শাহ্জাদার সাথে যুদ্ধ করে তারা। তুমুল যুদ্ধ। নিঝুমপুরীর দেয়ালগুলো লাল হয়ে যায়। লালে লাল হয়ে যায় চত্বর। এক লণ্ডভণ্ড অবস্থা। শেষমেশ দৈত্য-দানোরা পালিয়ে যায়, রণে ভঙ্গে দিয়ে। দূরে বহু দূরে। নিঝুমপুরী আযাদ হয়। সোনার কাঠি রূপোর কাঠি অদল-বদল করে দেয় বীর শাহ্জাদা। জেগে ওঠে সব আবার। তারপর হাসি আর খুশির হুল্লোড়। সারা নিঝুম-পুরীর শরীর জুড়ে স্বপ্ন আর স্বপ্ন।

তারপর? তারপর তো এ গল্পের শেষ। কিন্তু শেষ বললেই কি আর শেষ করা যায়? শেষেরও তো একটা রেশ থাকে। এখন সেই রেশের গল্প। এতো

www.pathagar.com

সময় ইনিয়ে বিনিয়ে যা বলা হলো, তা তো রূপকথার কাহিনী। কল্পনার পলকে উড়াল দিয়ে আকাশের নীলে হারিয়ে যাবার কাহিনী। এখন বাস্তবের দিকে চোখ ফেরানো যাক। আকাশের নীল থেকে একেবারে আমাদের এই সবুজ পৃথিবীতে। এখানে আছে মানুষ, পশু-পাখি, লতা-পাতা, গাছ-বৃক্ষ, নদী-সাগর আরো কতো কি। তাই তাদের নিয়ে আছে কতো গল্প, কতো কাহিনী। কখনো গা হিম করা, আবার কখনো খুশির ঝিলিক দেয়া। বিশেষ করে আমাদের মতো মানুষজনদের নিয়ে তো কতো গল্পই না ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এখানে- সেখানে। শুনলে মনে হয়, এ-ও যেন এক রূপকথার কাহিনী। আসলে এর সব ক'টাই কিন্তু বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঝলমলে সত্য। এখন সেই বাস্তবেরই গল্প। মানুষের গল্প। এই দুনিয়ার গল্প।

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ছিলেন এই দুনিয়ার প্রথম পুরুষ মানুষ। আর বিবি হাওয়া প্রথম নারী। এখন আমরা যারা দুনিয়ায় আছি, তারা সবাই তাঁদেরই ছেলেপুলে। মোটকথা, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম হলেন আমাদের সবার আদি পিতা। বিবি হাওয়া হলেন আদি মাতা। এজন্যেই তাঁদের বলা হয় বাবা আদম আর মা হাওয়া। তাঁরা কি করে দুনিয়ায় এলেন-এ নিয়ে অনেক বড় গল্প আছে। তবে অল্প কথায় সে গল্প হলো, বাবা আদম এবং মা হাওয়া আল্লাহ্‌র নিষেধ না শুনে গুনাহ্ করেছিলেন। অবশ্য ইবলীস অর্থাৎ শয়তানই তাঁদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে সে গুনাহ্‌র ফাঁদে ফেলেছিলো। আর শয়তানের কাজ তো একটাই, মানুষকে ফাঁদে আটকে দেয়া। গুনাহ্‌র দুর্গন্ধ শরীরে মেখে দেয়া। তবে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণে থাকলে শয়তান কিন্তু মানুষের কাছে ঘেঁষতেও ভয় পায়। আগেই বলেছি, আদম-হাওয়া আল্লাহ্‌র নিষেধ ভুলে গিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ তাঁদের দু'জনকেই এই দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন বেহেশতের বাগান থেকে। এটা ছিল তাঁদের শাস্তি। আল্লাহ্‌র কথা না শুনলে তো শাস্তি হবেই, এ কথা তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। তাঁরা এ কথাও বুঝলেন, ইবলীসের সুন্দর সুন্দর কথায় বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছে মাফ চাইলেন। কান্নাকাটি করলেন। আল্লাহ্ তো দয়ার মহাসাগর। তিনি তাঁদের অপরাধ মাফ করে দিলেন। তখন তাঁরা ঘর-সংসার শুরু করলেন এই দুনিয়ায়।

www.pathagar.com

এক দুই তিন করে মানুষ বাড়ে। সংসার বাড়ে। সাথে বাড়ে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধিও। বাড়ে মনের ভিতর আল্লাহ্‌র ভয়। শাস্তির ভয়। এ ভয়ই তাদের ফুলের পাপড়ি বিছানো পথে চালায়। আল্লাহ্‌র কাছাকাছি থাকতে শেখায়। সত্যের পাশা-পাশি হাঁটতে শেখায়। তাদের মনে হু হু করে সুখ-শান্তির ঠাণ্ডা বাতাস। হাসি-খুশির লাল-নীল প্রজাপতি। এ প্রজাপতি উড়তে উড়তে একদিন থেমে যায়। কারণ ঝিমিয়ে পড়ে বাতাস। বেশি বেশি হাসি আর আনন্দের কালো পলি ঢেকে ফেলে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ। আদম-সন্তানরা ভুলে যায় শাস্তির কথা। গুনাহ্‌র পরিণতির কথা। তার সৃষ্টিকর্তার কথা।

রূপকথার সেই নিঝুমপুরীর মানুষজনদের মতো তারা বেখেয়াল হয়। বেপথু হয়। আসলে সব কাজেরই তো একটা সীমা আছে। দেয়াল আছে। এ দেয়াল ডিঙালেই বিপদ। বেখেয়াল হলেই বিপদ। থেঁতলে যায় বুক, পাঁজর। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় চলতে-ফিরতে।

নিঝুমপুরীর মানুষজনরা হাসতে হাসতে বেখেয়াল হয়েছিলো। এই সুযোগ দৈত্য-দানোরা হাতছাড়া করে নি। তারা হৈ হৈ করে এসে পুরী দখলে নিয়েছিলো। আদম-হাওয়ার সন্তানদের বেলায়ও একই অবস্থা। যেই তারা বেখেয়াল হয়, অমনি ইবলীস তার কাজে লেগে যায়। চোখের সামনে টাঙ্গিয়ে দেয় লোভ-লালসার রঙীন পোস্টার। আরো কতো কথার স্বপ্নিল মিছিল। মানুষ তখন ইবলীসের পিছন পিছন হাঁটে। বসে, ঘুমায়। তাদের চোখে তখন লোভ-লালসার স্বপ্ন।

এ-ই তাদের কাল হয়। কাল হয় ইবলীস আর ইবলীসের সাঙ্গ-পাঙ্গদের। মানুষের চারপাশে অন্ধকারের বিশাল বিশাল পাহাড়-পর্বত। অসত্য আর অন্যায়ের বিরাট বিরাট দিঘি। এসব দিঘিতে তারা হাবুডুবু খায়। অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে পা ভাঙে, হাত ভাঙে। স্বস্তি নেই। শান্তি নেই।

আল্লাহ্‌ তো দয়ার মহাসাগর। রহমতের শীতল ঝরণা। মানুষের এ উলট-পালট অবস্থায় তাঁর দুঃখ হয়। কষ্ট হয়। তিনি উদ্ধারকারী

www.pathagar.com

পাঠান। তাঁরা আসেন একের পর এক। শত শত বছর পর তাঁরা আসেন। আসেন হাজার হাজার বছর পরও। এদেশে-সেদেশে তাঁরা আসেন। এ কালে-সেকালে তাঁরা আসেন। তাঁরা বুকের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে আসেন আল্লাহ্‌র কথা। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের কথা। ভাল-মন্দের কথা। সাথে তাঁদের আলোর একটা বড়সড় গোলক। যে গোলকের আলো অন্ধকার সাফ করে। গুনাহ্‌র ধূলিঝড়ে আটকে পড়া মানুষেরা আবার আলোর পথে আসে। মনের নরম ঘরটায় আল্লাহ্‌র কথাকে পুঁতে নেয়। ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনা করে, মাফ চায়। ইবলীস তখন বেদিশা হয়। তার মনের খুশি থেমে যায়।

এভাবে এসেছেন আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী দল। নবী-রসূলগণ। তাঁরা পথহারা মানুষকে পথের দিশা দিয়েছেন। শেষবারের মতো আল্লাহ্‌ যাকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমাদের প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তিনি কালোয় ঢাকা দুনিয়াকে আলোতে এনেছিলেন। ইবলীসের টাঙানো লোভ-লালসার পোস্টারগুলো ভেঙে ফেলেছিলেন। তাঁর ঘোড়ার খুরের আঘাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলো অসত্যের খসখসে শরীর।

তাঁর ইন্তেকালের পরের কথা।

সময়ের পর্দা ঠেলে ঠেলে দিন যায়, মাস যায়। মানুষ আবার বেখেয়াল হয়। শয়তান তার লোভ-লালসার পোস্টারগুলো ঠিকঠাক করে পথের বাঁকে বাঁকে লটকে দেয়। মানুষ তার ফাঁদে পড়ে হাবুডুবু খায়। পথহারা হয়, সত্যের পথ। আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পরখ না করে চলাফেরা করলে তো এমন হবেই। কিন্তু এ কথাটা কে বলে দেবে? নবী-রসূলের যুগ তো সেই কবেই শেষ। এ খবরটাও আল্লাহ্‌ই জানিয়েছেন আমাদের।

তাহলে এখন উপায়? উপায় অবশ্য আছে। এরপরও উদ্ধারকারীগণ আসেন। তাঁরাও যুগে যুগে আসেন। কালে কালে আসেন। প্রতি

www.pathagar.com

শতাব্দীর এ মাথায় সে মাথায় তাঁরা আসেন। সত্যের নিশান দোলাতে দোলাতে তাঁরা আসেন। ঘোড়ার খুরের ধূলি উড়াতে উড়াতে তারা আসেন। তাঁরা আসেন যেনো একেকজন সোনালী শাহ্জাদা।

মোটকথা, এই দুনিয়ার যেখানেই অন্ধকার, সেখানেই তাঁরা আলো হয়ে দেখা দেন। হাযিরা দেন এক প্রিয় বন্ধুর মতো। আপনজনের মতো। তাঁরা কিন্তু কেউ নবীও নন, রসূলও নন। তবে তাঁরা কারা? এমন একটা প্রশ্ন ঝট্ করেই করা যায়।

ইবলীসের এতসব আয়োজন যারা উল্টে-পাল্টে দেন তাঁদের বলা হয় মুজাদ্দিদ। নতুন কিছুই কিন্তু তাঁরা আমদানী করেন না। আর তা করার কোন সুযোগও রাখেন নি আল্লাহ্। তাই তাঁরা কেবল সত্যের উপর জমে ওঠা জঞ্জালের ধূলাবালি ছাফসুতর করেন মাত্র। তবে একটা কথা। তাঁদের সবাই যে মুজাদ্দিদের তালিকায় আসবেন এমন না-ও হতে পারে। তাতে কি! তাঁরা তো একই পথে হাঁটাহাঁটি করেন। কেউ একটু বেশি পথ হাঁটেন, কেউ কম। এই যা তফাত। আর এটিও তো আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই হয়।

তাঁরা ঝড়ের বেগে আসেন। শতব্দীর এ-মাথায় সে-মাথায় তাঁরা আসেন। নিছুমপুরীর সেই শাহ্জাদার মতোই রূপোর কাঠি সোনার কাঠি অদল-বদল করেন। পথহারা মানুষজনদের মনে আল্লাহ্র ভয়ের চেরাগটা উস্কে দেন। যার আলোতে আদম-হাওয়ার সন্তানরা চিনে নেয় ভালো-মন্দের পথ। সাথে সাথে শয়তানের কুটিল চেহারাও।

www.pathagar.com

ফুল পাখি নদী আর নানান রকম সবুজ সবুজ স্বপ্ন দিয়ে মোড়া আমাদের এ দেশ।

কখনো মেঘ। কখনো রোদ। আবার কখনো যোজন যোজন সুনীল আকাশ। ঘুঘু ডাকা দুপুর। পেঁচা ডাকা রাত। বাঁশডগায় কানা বগীর ঝাঁক। মালা হয়ে হঠাৎ ওড়ে আকাশের নীলে। নদীর ধার ঘেঁষে কাশবন। ফুলগুলো ধবধবে নিশানের মতো ওড়ে। নদীতে থির থির করে হেঁটে যায় ঢেউ। তর

অন্যরকম মানুষ

তর করে চলে পাল তোলা নাও, ছবির মতো। টুপঢাপ করে ঝরে বেগুনী আর সাদা মাখানো হিজল ফুল। চিরল চিরল নারকেল পাতায় বাতাসের কানাকানি। দাপাদাপি। মাটি থেকে উঠে আসে সোঁদা সোঁদা গন্ধ।

www.pathagar.com

মাতাল করে মন। এমনি আরো কতো কথা বলা যায়। কতো ছবি আঁকা যায় আমাদের এ-দেশের সবুজাভ গতর নিয়ে। কাকচোখের মতো স্বচ্ছ দিঘির কথা। শাপলার কথা, পদ্মাফুলের
কথা। ঝুপঝাপ করে ঝরা বৃষ্টির কথা। সোনালী সরষে ফুলের কথা। বাতাসে ছড়ায় মউ মউ গন্ধ। আরো কতো মজার মজার দৃশ্যের কথা। আযান দেয়া ধলপহর থেকে পিদিম জ্বলা সন্ধ্যে অবধি বললেও যার শেষ নেই।

তবে এখন যে দেশের কথা বলছি, যে দেশের কথা লিখছি, সে দেশে ফুল আছে, পাখি আছে, কিন্তু নদী নেই। নদীর কুলু কুলু ধ্বনি নেই। ছলাত ছলাত ঢেউ নেই। ফুল পাখি আছে ঠিকই, কিন্তু এদেশের মতো রকম রকম পাখি নেই। লাল নীল আর হলুদ হলুদ ফুলের বিচিত্র সমাবেশ নেই। আকাশ আছে, তবে মেঘ আর রোদের লুকোচুরি খেলা নেই। ঘুঘু ডাকা দুপুর বা পেঁচা ডাকা রাত নেই। সেখানে নিঝুম রাত আর ঠা ঠা দুপুর। যোজন যোজনব্যাপী সবুজের গালিচা নেই; আছে দিগন্তজোড়া চিক্ চিক্ করা বালি। ঝিক্‌মিক্ করে হলুদ হলুদ রোদ। গা পুড়ে যাওয়া সুরুজ। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কঙ্কাবতীর ঘাট পেরিয়ে অথই সাগরে পাহাড়ের মতো ঢেউ কেটে কেটে তবেই পৌঁছতে হয় সে দেশে। সে দেশ বালির দেশ। সে দেশ গরমের দেশ। সে দেশ উট আর দুম্বার দেশ। সে দেশে আছে আল্লাহ্‌র ঘর। সে দেশ আবে-যমযমের দেশ। সে দেশ নবী-রসূলের দেশ। সে দেশ পৃথিবীর সব মুসলমানের দেশ।

সে দেশ কোন্ দেশ? কি তার নাম? সে দেশ আরব দেশ।

যে সময়কার কথা বলছি, সে সময় আরব দেশে ছিল মিথ্যার মিশকালো অন্ধকার। মিথ্যা, অত্যাচার আর অবিচারের এক পুরু ওড়না ঢেকে রাখতো সে দেশ এবং সে দেশের মানুষের মন। মারামারি কাটাকাটি ছিলো তাদের নিত্য সাথী। তারা মাটির পুতুলকে মনে করতো তাদের আল্লাহ্, তাদের ত্রাণকারী। দিনের প্রখর সূর্য দেখে ভাবতো এই বুঝি তাদের স্রষ্টা। আবার

www.pathagar.com

রাতে কুসুমের মতো গোল চাঁদ দেখে তারা তার কাছেই মাথা নোয়াতো। মোটকথা, তখন সেখানকার মানুষেরা ছিলো অসভ্য, মূর্খ এবং অবিশ্বাসী।

আরবের যখন এই হযবরল অবস্থা, তখন পক্ষীরাজে উড়ে এলেন এক অন্য রকম মানুষ; আরবের মক্কানগরে। তাঁর হাতে সত্যের নিশান। তিনি এলেন, দেখলেন, ভাবলেন এবং জয় করলেন দেশ-মানুষ, মানুষের মন। তিনি তাঁর বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দিলেন সবার হৃদয়ে।

যতো সহজ করে বললাম 'তিনি এলেন এবং জয় করলেন', আসলে কিন্তু কাজটি ততো সহজে হয়নি। তিনি তাঁর বিশ্বাসকে প্রচার করতে গিয়ে অনেক বড় বড় বাধার দেয়াল ডিঙ্গিয়েছেন। অত্যাচারিত হয়েছেন। অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে তবেই তিনি তাঁর বিশ্বাসকে-সত্যকে মানুষের মনে চিরস্থায়ী করতে পেরেছিলেন। বাধার দেয়াল ভাঙাতে গিয়ে কখনো শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন। আবার কখনো হৃদয়ের মউ মউ ভালোবাসার গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এই মহাশক্তিমান মানুষটি কে? কি তাঁর পরিচয়ে?

তিনি মক্কার কুরায়শ সরদার আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ। আর একটু ঠিকঠাক করে বলছি। তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। যখন পৃথিবীর মানুষ বিশেষ করে আরবের মানুষ পাপের সাগরে ডুবে ডুবে পচা পানি গিলছিলো, তখন আল্লাহ্‌ উদ্ধারকারী পাঠালেন। তিনি মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। তিনি এসে সবাইকে সত্যের দিকে ডাকলেন। বললেনঃ

আল্লাহ্‌ এক, আমি তার রসুল। তোমরা আমার কথা শোনো। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে মাথা নত করো। তিনিই সবার সৃষ্টিকর্তা। এ পথেই তোমাদের শান্তি-অন্য কোন পথে নয়।'

এ ডাক শুনে অনেকেই তাঁর সত্যের জাহাজে উঠে এলো। অনেকে উঠলো না। অনেকে রসুলের শত্রু হলো। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

www.pathagar.com

করলো। তাঁর কাজে বাধা দিলো। মক্কার লোকেরা তাঁকে পাগল ভাবলো। তাঁর সত্যের জাহাজ আক্রমণ করলো।

একদিনের কথা। তখন তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকছেন। সত্যের পথে ডাকছেন।

একটি গাছের ছায়ায় বিশ্বনবী ঘুমোচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর এক শত্রু সে পথেই কোথায় যেনো যাচ্ছিলো। রসুলকে দেখে খুশিতে টগবগ করে উঠলো রক্ত। কারণ শত্রু তার হাতের মুঠোয়। তলোয়ারের এক কোপে ধড়টা নামিয়ে দেয়া যাবে। মনে তার আনন্দের ঢেউ। এ কাজ করতে পারলে সবাই তাকে বাহবা দেবে। সে মনে মনে ভাবলো, দেখি মুহাম্মদকে তার আল্লাহ্ কি করে রক্ষা করে! সে রসূল (সা)-এর সামনে দাড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। রসূল (সা) ঘুম থেকে জেগে দেখেন সামনে শত্রু। তার হাতে খোলা তলোয়ার।

লোকটি (রাগে গজ গজ করতে করতে)-এই মুহাম্মদ দেখবো কে আজ তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করে। এক কোপে তোমার সব পাগলামো উড়িয়ে দিচ্ছি। আমার হাতেই তোমার জীবন। ডাকো তোমার আল্লাহ্ কোথায়। (দুপুরের ঝলসানো রোদে তার হাতের তলোয়ার ঝিক্‌মিক্ করছে।)

রসূল (তাঁর স্বভাবসুলভ দৃঢ়তার সাথে বললেন)- আমাকে আমার আল্লাহ্‌ই তোমার হাত থেকে রক্ষা করবে। যিনি তোমার, আমার এবং বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা। যিনি রাতের পর দিন আনেন। গাছে গাছে ফুল ফোটান। কাউকে মারেন। কাউকে বাঁচান। তিনিই আগামীদিনের কথা ভালো জানেন। তাঁর হাতেই সবার জীবন। (রসূল লোকটির দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন।)

রসূল (সা)-এর সাহস এবং কথা শুনে লোকটির মুখ তখন ফ্যাকাশে। হাতের তলোয়ার থরথর করে কাঁপছে।

www.pathagar.com

হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এলো। খসে পড়লো তলোয়ার। খসে পড়া তলোয়ার কুড়িয়ে নিলেন রসূল (সা)। তাঁর চোখের তারায় তখন সিংহের নাচানাচি। তলোয়ার উচিয়ে তিনি লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?

লোকটি- আপনিই আমার জিম্মাদার। ইচ্ছা করলে মারতেও পারেন, আবার বাঁচাতেও পারেন।

ভয় আর আতঙ্ক তার সারা গতরে। এই বুঝি সব বাহাদুরির শেষ। শেষ জানটাও। ঠোঁট দু'টি কাঁপছে। কাঁপছে পাপের নর্দমায় ডুবে থাকা মনটাও। নাকে মুখে ঘাম।

রসূল (সা) দেখলেন তার অসহায় অবস্থা। মায়া হলো তাঁর। তিনি বললেন, তাহলে যাও।

ছাড়া পেয়ে শুকিয়ে যাওয়া গলায় যেনো পানি এলো লোকটির। কম কথা তো নয় ! একেবারে মরণের ঘর থেকে ফিরে আসা। কিছুটা পথ চলে গিয়েছিলো সে। আবার ফিরে এলো রসূল (সা)-এর কাছে। তার চোখে-মুখে ভাবনার লুকোচুরি। এমন মহামানুষ আর কে আছে? কার আছে এত বড় কলিজা? জানের দুশমনের সাথে এমন ব্যবহার! তবে কি তাঁর কথাই সত্য? মনে তার উথাল-পাথাল ঢেউ। ঢেউয়ের আঘাত লেগে লেগে একটু একটু করে পাপের ধ্বস ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে।

তার মন বদলে গেলো মুহূর্তে। হাতে তুলে নিলো সত্যের সবুজ পতাকা। সে সত্যকে মেনে নিলো। রসূল (সা)-কে মেনে নিলো। আল্লাহ্‌কে মেনে নিলো। রসূল (সা) তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। লোকটির পাঁজর ভেদ করে তখন সত্যের সুবাসিত বাতাস ঢুকছে!

www.pathagar.com

এগিয়ে আসছে এক বিরাট সৈন্যদল। সংখ্যায় তারা দশ হাজার। এ বিরাট সেনাবাহিনীর সেনাপতি দেশের 'রাজা' নিজে। তিনি একজন দুর্ধর্ষ সেনাপতি এবং যোদ্ধারূপে পরিচিত। আশে-পাশের রাজাদের তা'ই ধারণা। তাদের ধারণা কিন্তু মিথ্যে নয়। তিনি বেশ কিছু যুদ্ধে এ-কথা প্রমাণ করেছেন। যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো, তিনি কিন্তু এ

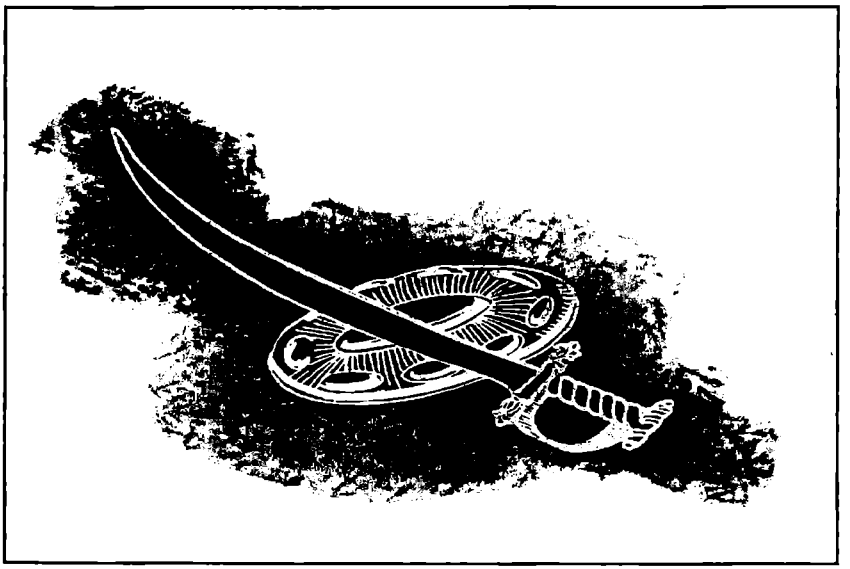

সত্যের সুবাতাস

সব যুদ্ধ-টুদ্ধ মোটেও পসন্দ করেন না। তিনি মনে করেন, অযথা মারামারি-কাটাকাটি করা ভালো না। আলোচনার ভেতর দিয়ে যে কোন সমস্যার সমাধান করা যায়। তিনি সব কিছুতেই শান্তি চান। প্রথমে তিনি শান্তির পথে আগানোই ভালো মনে করেন। আর যদি সে পথে কোন কাজ না হয়, তবেই আসে শক্তির কথা।

www.pathagar.com

দুর্ধর্ষ সেনাপতির জঙ্গী সেনারা এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি সেনার হৃদয়ে পত পত করে উড়ছে সত্যের সোনালী পায়রা। তারা খুব দ্রুত এবং সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে। শত্রুপক্ষ যেনো তাদের আগমনের কথা সহজে জানতে না পারে, সেদিকে সবার সজাগ দৃষ্টি। এ ব্যাপারে সেনাপতির কড়া নির্দেশ। সেনাপতির ইচ্ছা- বিপক্ষ দলকে তৈরি হওয়ার সময় না দেয়া। হঠাৎ আক্রমণ করে যুদ্ধে জয়ী হওয়া। এতে করে দু'দিকে লাভ। মারামারি-কাটাকাটি কম হলো অথবা একেবারেই হলো না। আবার যুদ্ধেও জয়লাভ করা গেলো। সেনাপতি এক তীরে দুটো পাখিই শেষ করতে চান। কারণ, তিনি শান্তিকে হৃদয়ের সাথে লেপটে রেখেছেন। তিনি তো শান্তির জন্যে যুদ্ধ করছেন। দেশের পর দেশ জয় করে চলেছেন, আর সে মাটিতে উড়িয়ে দিচ্ছেন কাশফুলের মতো ধবধবে শান্তির পতাকা।

মদীনার 'রাজা' তখন রসূল (সা)। রাজা বলতে আমরা যা বুঝি, তিনি কিন্তু সে জাতীয় কোন রাজা নন। জরির পোশাক, মণি-মুক্তার মালা, সোনার মুকুট-কিছুই তাঁর নেই। তিনি মানুষের মনের রাজা। জনগণের সুখ-দুঃখের রাজা। বিরাট রাজ-প্রাসাদে তাঁর বাস নয়। তিনি থাকেন জনতার হৃদয়ের রাজপ্রাসাদে। সেখানেই তাঁর ঝলমলানো সিংহাসন। মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা মাখানো সিংহাসানে বসেই তিনি দেশ শাসন করেন।

চারদিকে শত্রু। খুব বুদ্ধি খরচ করে তাঁকে সবদিক সামলাতে হয়। কখনো যুদ্ধ। কখনো সন্ধি। কখনো কূটনীতির মারপ্যাঁচ। এভাবেই রসূল (সা)-তাঁর শান্তির বাণী বিলিয়ে যাচ্ছেন মানুষের মাঝে। আর তিনি যা করছেন সবগুলোই কিন্তু আল্লাহ্‌র আদেশে এবং নির্দেশে।

কুরায়শরা সন্ধি ভঙ্গ করেছে অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো তারা অমান্য করেছে। মুসলমানদের আশ্রিত এক গোত্রের ওপর চালিয়েছে আক্রমণ। তাই আর বসে থাকা যায় না। বিপক্ষ দল যখন ক্ষমার অর্থ বোঝে দুর্বলতা বা অন্যকিছু তখন শক্তি দিয়েই শক্তির জবাব দিতে হয়। রসূল (সা)-এর চোখ দু'টো ঝলসানো সূর্যের মতো জ্বলে উঠলো। তিনি মক্কা আক্রমণ করলেন।

মুসলিম বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করলো, কুরায়শদের তখন অবাক হবার পালা। কারণ যুদ্ধের জন্যে তৈরি হবার সময় কই। ভীত-সন্ত্রস্ত মক্কাবাসীরা এখন রসূল (সা)-এর হাতের মুঠোয়। কুরায়শরা ভাবলো, রসূল

www.pathagar.com

হয়তো প্রতিশোধ নেবেন। কারও বুঝি আর রক্ষা নেই। তারা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কারণ, মক্কাবাসীরা রসূল (সা)-কে তো আর কম অত্যাচার করে নি। সত্যের বাণী প্রচার করতে গিয়ে বারবার তিনি বাধা পেয়েছেন। রসূল (সা)-এর প্রাণের ওপরও হামলা হয়েছে বহুবার। মক্কাবাসীদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে তাঁকে নিজ মাতৃভূমি থেকে হিজরত করতে হয়েছিলো। আশ্রয় নিতে হয়েছিলো মদীনায়। সে সব তো আর ভুলে যাওয়ার কথা নয় ! কিন্তু রসূল (সা) ভাবছেন অন্য কিছু। তিনি অতীতের সব কথা ভুলে গেলেন। তাঁর হৃদয়ে শান্তির সুনীল ঝালর দুলছে। সব মক্কাবাসীকেই মাফ করে দিলেন তিনি। কারণ, তিনি তো দয়ার নবী। মানুষের নবী। সত্যের নবী। শান্তির নবী। তিনি কি করে প্রতিশোধ নেবেন? কি করে অত্যাচার করবেন? মক্কাবাসীদের দ্বিতীয়বার অবাক হবার পালা। তারা ভাবলো, রসূল (সা) হয়তো রসিকতা করছেন। এখনি তাদের গর্দান নেবেন। যখন তারা দেখলো, না, এটা রসূলের রসিকতা নয়, সত্যিই তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন, সবাই তারা মুক্ত, কুরায়শরা তখন বিস্মিত এবং অভিভূত। ফ্যাল ফ্যাল করে তারা রসূলের মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। তবে কি ইতিহাস পাল্টে গেলো?

মক্কাবাসীরা রসূল (সা)-এর ডাকে সাড়া দিলো। সত্যের পতাকা তারা কাঁধে তুলে নিলো। কুরায়শ সরদার আবূ সুফিয়ানও এগিয়ে এলেন। হৃদয়ে এঁকে নিলেন সত্যের বাণী।

মক্কার মাটিতে সত্যের পতাকা পত পত করে উড়ছে। আলো-বাতাস, মাটি, পাহাড়, গাছ, ফল-ফুল সবখানেই কুল-কুল করে বইছে খুশির ঝরণা। কারণ তাদের মানুষকে তারা আবার ফিরে পেয়েছে। অনেকদিন পর স্বদেশের মাটিতে পা রেখে রসূল (সা)-এর মনেও খোশবু ছড়াচ্ছে আনন্দের গন্ধরাজ।

মক্কা বিজয়ের ক'একদিন পর। রসূল (সা) হাঁটাহাঁটি করছিলেন। তিনি দেখলেন, এক বুড়ী গাছতলায় বসে কাঁদছে, আর কি যেনো বিড় বিড় বকছে। তার আশে-পাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু পোটলা-পুটলি। ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর। চেহারায় একটা অজানা ভয়ের ছাপ। এ দৃশ্য দেখে রসূল (সা)-এর মনে দুঃখের নদী বয়ে গেলো। তিনি বুড়ীর কাছে এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ

www.pathagar.com

রসূল-বুড়ীমা, তোমার কিসের দুঃখ? আমি কি তোমার কোন উপকারে আসতে পারি? তোমার দুঃখের কথা আমার কাছে বলো।

বুড়ী রসূল (সা)-কে চিনতে পারলো না। সে তখন রসূল (সা)-এর চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে গালাগাল দিতে লাগলো। এ বুড়ী সত্যধর্ম প্রচারে বাধা দিয়েছে পদে পদে। অত্যাচার করেছে অনেক।

বুড়ী-মুহাম্মদ একটা ভণ্ড, ধোকাবাজ। তার কথায় কখনো কান দিও না। সে বাপ-দাদাদের ধর্ম ত্যাগ করে কি সব আজে-বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছে। সে নচ্ছারটা নিপাত যাক। বাপ-দাদার ধর্ম রক্ষার জন্যে আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমার সাথীরা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আমি বুড়া মানুষ, এ নিয়ে এগোতে পারছি না। আমাকে আমার সাথীদের কাছে পোঁছে দাও না !

আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা) তখন বুড়ীর বিরাট বোঝাটি কাঁধে তুলে নিয়ে আগে আগে চললেন। তিনি যখন বুড়ীর সাথীদের কাছাকাছি এলেন, তখন প্রতিটি মানুষ অবাক হয়ে গেলো। তারা বুড়ীর সাহায্যকারীর দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো সবাই স্বপ্ন দেখছে।

বুড়ীর সাথীরা ভাবছে, এ কি করে সম্ভব ! দেশের রাজা বুড়ীর বোঝা কাঁধে নিয়েছেন! শত্রুকে এভাবে সাহায্য করছেন! তারা যে তাঁর চির-শত্রু ! তবে কি মুহাম্মদ (সা) মহান? সত্যের সাধক? তিনি কি মানুষ, না অন্য কিছু? তাদের মাঝে ভাবান্তর এলো। অনেকের মনের দরোজা একটু একটু করে ফাঁক হতে থাকলো। আর সে ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করলো সত্যের আলো।

রসূল (সা)-এর চেহারায় তখন ঝিলমিলানো বেহেশতী হাসি।

www.pathagar.com

সত্যের আলো তখনো উঁকি দেয় নি। সে সময়টাকে বলা হয় জাহেলিয়াতের যুগ। অর্থাৎ ঘোর অন্ধকার যুগ। পৃথিবীর মানুষ-বিশেষ করে আরবের মানুষ নানারকম পাপে ডুবেছিলো। আল্লাহ্ বলে তারা কাউকে চিনতো না, আল্লাহ্র ভয় তো দূরের কথা। এই পৃথিবীর স্রষ্টা কে? তাদেরই বা তৈরি করেছে কে? এসব কথা চিন্তা করারই বা তাদের সময় কোথায়! তারা ছিলো অবিশ্বাসী। তারা মূর্তি পূজা করতো। শক্তি দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করতো।

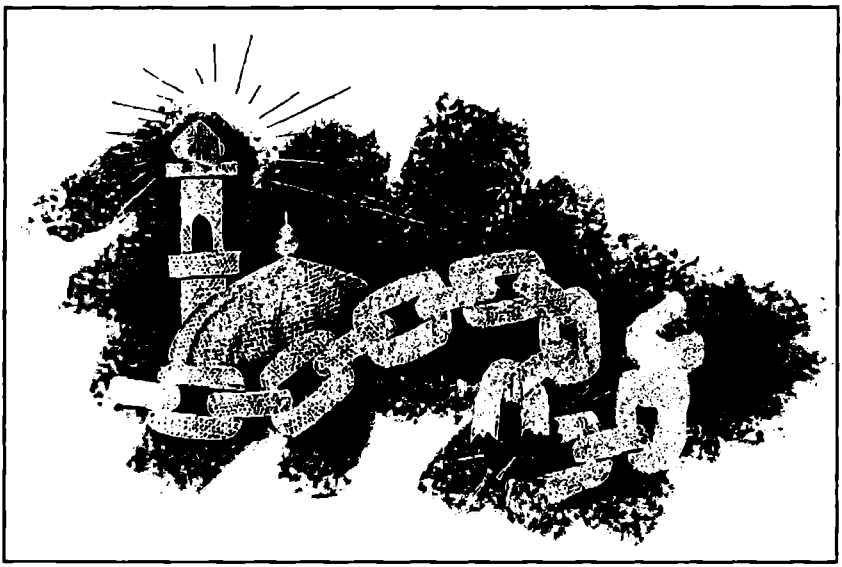

মধুঝরা কণ্ঠ

আরবে তখন প্রচলিত ছিলো দাসপ্রথা। দাসদের তারা কিনে নিতো। তাদের কেনা দাসদের সাথে ব্যবহার করতো গরু-ছাগলের মতো। মনিবের ইচ্ছার ওপরই ছিলো দাসদের জীবন। অত্যাচারের প্রতিবাদ করা ছিলো দাসদের জীবন। অত্যাচারের প্রতিবাদ করা ছিলো

www.pathagar.com

অকল্পনীয় ব্যাপার। এক কথায় যাকে বলা যায় পরাধীন জীবন। তাদের মনের ইচ্ছার কোন মূল্য ছিলো না। সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যেতে হতো।

এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে টু শব্দটি উচ্চারিত হবার উপায় নেই। তাহলে গর্দান যাবে। এমন কি এক দাসের সাথে অন্য দাসের প্রকাশ্যে কোন রকম কথা বলা বা কুশল বিনিময়ও ছিলো নিষিদ্ধ। আন্দোলনের কথা তো দূরে। দাসীরা ছিলো মনিবের ভোগের জিনিস। এই দাস-দাসীরা বেশির ভাগই ছিলো কাফ্রি। কালো মানুষ। তাদেরকে বলা হতো গোলাম।

আরবদের কাছে ন্যায়-অন্যায়ের বালাই ছিলো না। তাদের ছিলো এক বিশৃঙ্খল জীবন।

যখন পাপের কালো পর্দা ভারি হয়ে এলো, তখনই বিশ্বনবীকে পাঠালেন আল্লাহ্, শান্তির দূত করে। তিনি এসে পাপী মানুষকে সত্যের আলোর দিকে ডাকলেন। শান্তির রঙ্গিন রাজপ্রাসাদের দিকে ডাকলেন। বিশ্বনবী জানালেন, সব মানুষ স্বাধীন-কেউ কারো অধীন নয়। প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের ভাই। মানুষে মানুষে কোন উঁচু-নীচু ভেদাভেদ নেই। মানুষ একমাত্র আল্লাহ্র দাস। আর কারো নয়। আল্লাহ এক। তোমরা আল্লাহর পথে এসো। সত্যের পথে এসো।' অনেকেই তাঁর ডাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পা বাড়ালো, আবার অনেকে রুখে দাঁড়ালো। রুখে দাঁড়িয়েই তারা বসে থাকলো না। যারা শান্তির দূতের ডাকে সাড়া দিলো তাদের ওপর শুরু করলো অকথ্য অত্যাচার।

আর যারা সত্যকে গ্রহণ করতে চাইলো, তারা তাদেরকে দিলো বাধা। উচ্চারিত হলো কঠোর হুঁশিয়ারী। তাদের সামনে পেশ করা হলো লাল-নীল অত্যাচারের ফর্দ। কিন্তু কিছুতেই কিছু করা গেলো না। দলে দলে মানুষ ছুটতে লাগলো শান্তির আলোর দিকে।

কাফ্রি গোলামদের কানেও পৌঁছলো সে ডাক। তাদের মনের আকাশে তখন মুক্তির পায়রা ছটফট করছে। শুধু উড়ালের অপেক্ষায়। তবে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না। অবশেষে উড়াল দিলো। সামনে যোজন

www.pathagar.com

যোজন সুনীল আকাশ। গোলামরা শান্তির দেখা পেলো। সত্যের দেখা পেলো। এবং পেলো মুক্তির সবুজ উল্লাস।

হযরত বিলাল (রা) ছিলেন এমনি একজন কাফ্রি গোলাম। তাঁর কানেও পৌঁছলো সে সত্যের ডাক। মুক্তির ডাক। তিনি গোপনে সে ডাকে সাড়া দিলেন। মনের ফুলদানিতে সাজিয়ে নিলেন সত্যের সবুজ গোলাপ। কিন্তু সে কথা গোপন থাকলো না। বিলাল (রা)-এর মনিব উমাইয়া জেনে ফেললো সে খবর।

উমাইয়া ছিলো খুবই খারাপ লোক। ভীষণ অত্যাচারী এবং একজন মূর্তিপূজক। খবর শুনে তার রক্তচাপ বেড়ে গেলো। বিলাল (রা)-এর ওপর শুরু হলো অকথ্য জুলুম। তার গলায় রশি বেঁধে রাস্তায় টানা-হেঁচড়া করা হলো। এতে থেঁতলে গেলো তাঁর শরীর। রক্তাক্ত হলো সমস্ত গতর। কিন্তু বিলাল তাঁর বিশ্বাসে অটল। এরপর সূর্যের দিকে মুখ করে গরম বালির ওপর শুইয়ে রাখা হলো তাঁকে। বুকে চাপা দেয়া হলো আগুনের মতো গরম বিরাট পাথর। তবু বিলাল (রা)-এর মুখে এক কথা- আহাদ। আহাদ। অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক।

হযরত আবূ বকর (রা) অনেক টাকা দিয়ে কিনে নিলেন অত্যাচারী উমাইয়ার কাছে থেকে তার অবাধ্য গোলাম বিলাল (রা)-কে। এরপর তিনি তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। বিলাল এখন মুক্ত। আজ থেকে তিনি আর কারোর দাস নন। একজন স্বাধীন মানুষ।

হযরত বিলাল (রা)-এর গায়ের রঙ ছিলো কালো। চেহারা সুরতেও সুন্দর ছিলেন না তেমন। কিন্তু তাঁর গলা থেকে ঝরতো মধু। তাই রসূল (সা)-তাঁকে নবীর মসজিদের মুয়ায্যিন নিযুক্ত করেছিলেন। বিলাল (রা) যখন আযান দিতেন, মনে হতো, বাতাস থেকে যেনো মধু ঝরে ঝরে পড়ছে। তাঁর কণ্ঠের ধ্বনি শুনে কোকিলও বুঝি শরমে মুখ ঢাকতো। তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী- সত্যভাষী।

হযরত বিলাল (রা)-এর জীবনেরই একটি ঘটনা। তিনি তখন মদীনায় রসূল (রা)-এর মসজিদে মুয়ায্যিন। একদিন তাঁর ভাই আবূ রুয়াইহা এসে

www.pathagar.com

আবদার জানালেন, তাঁর বিয়ের ব্যাপারে ইয়ামেন থেকে কিছু মেহমান এসেছেন, হযরত বিলাল (রা) যেনো তাঁদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে বিয়ের ব্যবস্থাটা পাকাপোক্ত করে ফেলেন।

বিলাল (রা) তাঁর ভাইয়ের আবদার রক্ষা করলেন। কনেপক্ষের সাথে আলাপে বসলেন। ইয়ামেনবাসীদের তিনি জানিয়ে দিলেন, তাঁর ভাইয়ের স্বভাবধর্ম কোনটাই ভালো নয়। যদি এসব কথা জেনেও তাদের কন্যা বিয়ে দিতে রাযি হন, তবে তাঁরা আবূ রুয়াইহার কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে পারেন- সেটা তাঁদের ইচ্ছা। তিনি কোন কিছু গোপন রেখে কথা বলা পছন্দ করেন না; তিনি যদি কোন কথা গোপন করেন, তবে সে জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে জবাব দিতে হবে, সে কথাও ইয়ামেনবাসীদের তিনি জানিয়ে দিলেন।

কনেপক্ষ বিলাল (রা)-এর কথা শুনে তো একেবারে থ'। নিজের ভাই সম্পর্কে এমন সত্য কথা কেউ তো কোনদিন বলেনি। তাঁরা এ বিয়েতে রাযি হয়ে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন, এমন একজন সত্যবাদী লোক এ বিয়ের প্রস্তাব করেছেন এটাই তো তাদের সৌভাগ্য।

হযরত বিলাল (রা)-এর পরিচয় পেতে হলে এই একটিমাত্র ঘটনাই যথেষ্ট।

আমরা কি কখনো এমনটি করে থাকি? কোন বিষয় গোপন করার সময় কি আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করি? আল্লাহ্ কিন্তু সব গোপন খবর জানেন।

www.pathagar.com

জমিদারদের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। দু-একজনের কথা হয়তো আলাদা, তবে প্রায় সব জমিদারই ছিলো অত্যাচারী। তারা প্রজাদেরকে অত্যাচার করতো। তাদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কোনো প্রজার ছিলো না। কোনো প্রজা জুতা পায়ে অথবা ছাতা মাথায় জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে পারতো না। এটাকে জমিদাররা মনে করতো প্রজাদের ঔদ্ধত্য। বেয়াদবি। আর এর কোনো ব্যতিক্রম হলেই শাস্তি।

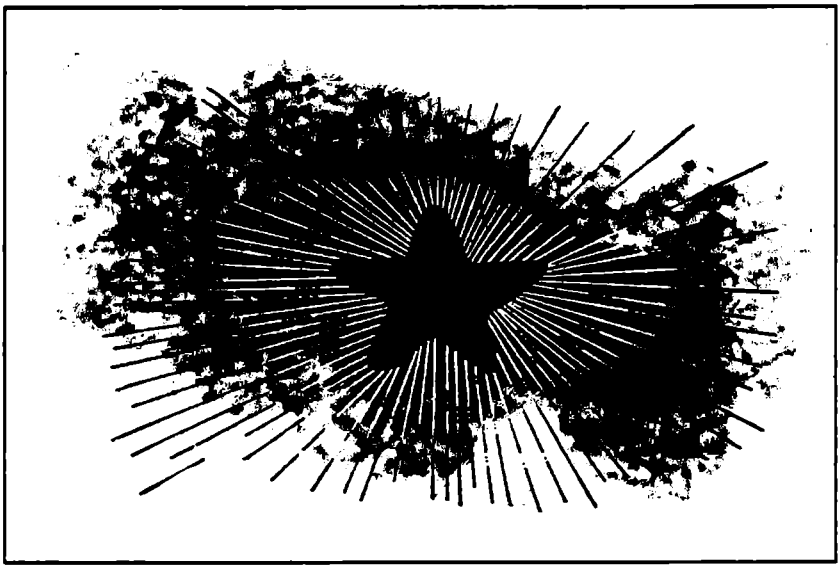

কুসমিত জোস্‌না

জমিদাররা অবশ্য এখন আর নেই। কিন্তু জমিদারী স্বভাবটা এখনো অনেকের মনেই ঘাপটি মেরে আছে।

আরো আগে। অনেক আগে। যখন দাসপ্রথা চালু ছিলো। মানুষ বেচা-কেনা হতো। সে সময়কার কথা। আমরা যদি সেই দিনগুলোর মাঝ

www.pathagar.com

দিয়ে হেঁটে যাই, চোখের দৃষ্টিগুলো এদিক-ওদিক মেলে ধরি, দেখবো বিচিত্র বিচিত্র করুণ দৃশ্য। দাসদের ইচ্ছা বলে কোনো কিছু ছিলো না। মনিবদের হাতে ছিলো তাদের জীবন-মরণ। দাসদের তারা যা ইচ্ছা তা-ই করতো।

যখন এই দুনিয়ায় ইসলাম এলো, একটু একটু করে শান্তির খোশবু ছড়াতে লাগলো, তখনই বেচারা দাসদের ভাগ্যে ডিমের কুসুমের মতো জোস্না খেলা করলো। সে কথায় পরে আসছি।

হ্যাঁ, বলছিলাম রাজা-প্রজার কথা। এখনো অনেক দেশ আছে, যেখানকার জনগণ দাসদের মতোনই জীবন কাটাচ্ছে। সেখানে শাসক এবং জনগণের সম্পর্ক ঠিক যেনো দাস-মনিবের সম্পর্ক। জনগণ খাটবে পশুর মতো, আর তার বিনিময়ে পাবে কিছু খাবার। রাত কাটাবার মতো একটা আশ্রয়। ঠিক যেনো গৃহপালিত কুকুর। শাসকের কাজের কোনো সমালোচনা করা যাবে না। করলে জেল-জুলুম। এমন কি জীবন পর্যন্ত চলে যেতে পারে। তেমনি এক দেশের রাজা তো জোর গলায়ই বলে দিলেন, তাঁর কাছে শক্তিই সব কিছু। জনগণের ইচ্ছা আবার কি? তিনি ঘোষণা করলেন, বন্দুকের নলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সব ক্ষমতা। তাঁর কথাই ছিলো দেশের আইন। তাঁর কথার ওপরই চলতো দেশ-জনগণ। একটু নড়চড় হলেই উড়ে যাবে মাথার খুলি।

তাঁর যখন এতোই ক্ষমতা, তাঁকে আমরা রাজা না বলে কি বলতে পারি?

এমনি আরো কিছু দেশ। সেখানে মানুষ পশুর মতো জীবন কাটাচ্ছে। তাদের নিজস্ব কোনো আমোদ-আহলাদ নেই। মোট কথা, ব্যাক্তি-স্বাধীনতা বাক-স্বাধীনতা বলে কোনো কিছু নেই। সমগ্র দেশটাই যেনো কয়েদখানা-এক বন্দীশালা। সেখানে রাষ্ট্রপ্রধানদের অথবা সরকারের কোনো কাজের প্রতিবাদ করলেই গুলি,নয়তো শ্রমশিবির। ক্ষমতাসীনদের কার্যকলাপ নিয়ে কিছু বলা, জীবনকে আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে দেয়া আর কি!

কিছুদিন আগের কথা। মারা গেলেন সম্রাট হাইলে সেলাসি। তিনি ছিলেন ইথিওপিয়ার সম্রাট। তাঁর ছিলো দোর্দণ্ড প্রতাপ। সম্রাটের কোনো কাজ সম্পর্কে টু শব্দটিও করা যেতো না। করলে কঠোর শাস্তি। সম্রাট হাইলে সেলাসি যখন সিংহাসনে, ইথিওপিয়া ছিলো তখন এক ত্রাসের রাজ্য। রাজার বিরুদ্ধে কথা বলা ! সম্রাট তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মেরে গাছে গাছে ঝুলিয়ে রাখতেন। এমনি যখন অবস্থা, কে আর কথা বলে!

www.pathagar.com

বিশেষ করে মুসলমানদের ওপরই সম্রাট তাঁর তরবারির ধার পরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন বেশি।

তাছাড়া অত্যাচারী ফ্রাঙ্কোর কথা। এই স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কোর নাম শুনলে স্পেনের জনগণ এখনো আঁতকে ওঠে।

রাজা-প্রজার কথা বলতে গেলে এমনি আরো অনেক কথা বলা যায়। রচনা করা যায় রাজা-প্রজা অর্থাৎ শাসক ও জনগণের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথামালা। যেমন মিসর। মিসরের সিংহাসনে তখন রাজা ফারুক। রাজা ফারুক ছিলেন খুবই অত্যাচারী। মানুষকে তিনি মানুষ বলেই মনে করতেন না। ভোগবিলাসে সব সময় গা ভাসিয়ে রাখতেন। জনগণের কথার কোনো মূল্যই ছিলো না তাঁর কাছে। তাই হাসানুল বান্নার মতো একজন মহাপুরুষকেও প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করে মারা হলো। তিনি রাজা ফারুকের কাছে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন। এই ছিলো তাঁর অপরাধ।

তারপরে নাসের সরকারের কথা। তারা সাইয়েদ কুতুব এবং আরো অনেক নির্ভীক দেশপ্রেমিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলো। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা সরকারের কাজের সমালোচনা করেছিলেন। চালু করতে বলেছিলেন ইসলামী শাসন। জনগণের হাতে থাকবে দেশ শাসনের ক্ষমতা, এই ছিলো তাঁদের কথা। তাঁরা তখনকার ক্ষমতাসীনদের সত্যিকার ইসলামের দিকে ডেকেছিলেন। সত্যের দিকে ডেকেছিলেন। শান্তির গাছতলায় আসতে বলেছিলেন।

আসলে সব অত্যাচারী রাজাই এ-রকম। কারণ তাদের মনে আল্লাহ্‌র কোনো ভয় নেই। স্রষ্টার প্রতি কোনো আনুগত্য নেই। আল্লাহ্‌র কথামতো তারা চালে না। তারা চলে নিজেদের তৈরি এক মনগড়া পথে। কিন্তু যখন দুনিয়াতে ইসলামী খিলাফত ছিলো অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আইন অনুসারে দেশ চলতো, তখন দেশের শাসক এবং জনগণের মাঝখানে কোন দেয়াল ছিলো না। কোন প্রকার ভুল বোঝাবুঝি ছিলো না। কে রাজা, কে প্রজা তা বোঝাই ছিলো মুশকিল। অত্যাচার-অবিচারের কথা আসতেই পারে না। কারণ সে সমাজে দেশের জনগণের কাছে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হতো রাজাকে। তাছাড়া তো আছে আল্লাহ্‌র ভয়। সে রাজাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলতে

www.pathagar.com

হতো। তা না হলে সে ব্যক্তির দেশের শাসক হওয়ার ছিলো অযোগ্য। আল্লাহ্‌র আইনে রাজা-প্রজা সব সমান।

হযরত উমর (রা) তখন ইসলামী খিলাফতের দ্বিতীয় খলীফা। তাঁর রাজ্যে বইছে শান্তির সোনালী-রূপালী বাতাস। সে সময়কার একটি ঘটনার কথা বলছি। বিশাল জমায়েতে খলীফা ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে দেশের জনগণ, তোমরা যদি আমার মাঝে কোনো প্রকার বক্রতা দেখ, তবে আমাকে সোজা করে দিও।'

এই বিশাল জমায়েতের মাঝখান থেকে তখনই এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে কোষমুক্ত তরবারি। সে ব্যক্তি তরবারি উঁচু করে বললেন, 'হে খলীফা উমর (রা) আমরা যদি আপনার মাঝে কোনো প্রকার বক্রতা দেখি, তবে এই ধারালো তরবারি দিয়ে আপনাকে সোজা করে দেবো।'

লোকটির কথা শুনে খলীফার চেহারায় একটা হাসির ঝিলিক খেলে গেলো। তিনি মনে মনে নিজেকে ঝরঝরে মনে করলেন। আল্লাহ্‌র কাছে নিজকে ভারমুক্ত মনে করলেন। উমর (রা) বললেন, 'আল্লাহ্‌র হাজার শোকর, তিনি উমর (রা)-এর খিলাফতে এমন ব্যক্তিও সৃষ্টি করেছেন, যে তাকে ক্ষুরধার তরবারি দিয়ে সোজা করতে পারে।'

পৃথিবীতে তো কতো তন্ত্রমন্ত্রই চালু আছে। কই, কোথাও কি এমনটি আছে, যেখানে রাজা-প্রজার সম্পর্ক এমন?

একটি ইসলামী সমাজেই এ জাতীয় কথা বলা সম্ভব। অন্য কোথাও নয়। আমরা কি আবার দুনিয়ায় সে সমাজ সৃষ্টি করতে পারি না? যেখানে রাজা-প্রজার সম্পর্ক হবে ভাই ভাই। সে রাজ্যে চলবে আল্লাহ্‌র আইন। আর রাজা চলবে আল্লাহ্‌র নির্দেশে এবং জনগণের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে। সে রাজ্যে বইবে শান্তির হিমেল বাতাস। বাঁশপাতার মতো ঝুর ঝুর করে ঝরবে হাসি। প্রতিটি মানুষের চেহারায় খেলবে সত্যের সোনালী জোস্‌না।

ইচ্ছা করলেই তো আমরা রাজা-প্রজার মাঝখানের দেওয়ালটা ভাঙতে পারি। তাহলে আমরা সে পথ ধরেই হাঁটা শুরু করিনা কেনো ?

সামনে অন্ধকার? তেপান্তরের মাঠ? সাত সমুদ্দুর তেরোনদী ? তাতে কি!
দেখা যাক, দুর্বা ঘাসের মতো সবুজ সে স্বপ্নের রাজ্য আর কতো দূর।

www.pathagar.com

একটি রাজপ্রাসাদ। সেখানে থাকেন এক রাজা। তবে এই রাজপ্রাসাদের তেমন কোন জৌলুস নেই। নেই কোন সান্ত্রী পাহারাদার। লাল-নীল ঝাড়ে জ্বলে না হাজার রঙের বাতি। মউ মউ করে না আতর-গোলাপের গন্ধ। নেই মুক্তা-মানিক খচিত সিংহাসন অথবা উজির-নাজির-সভাসদ-মোসাহেবে

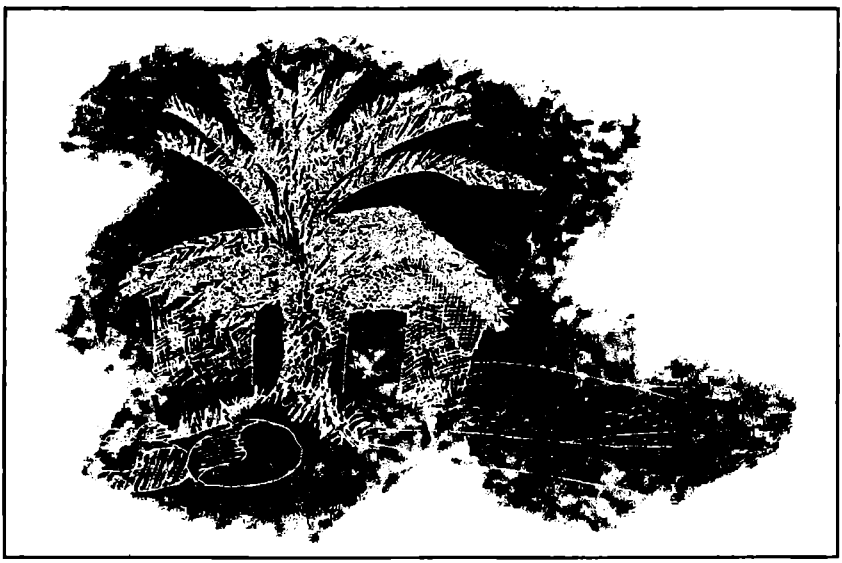

একজন রাজার গল্প

গম্‌গম্‌ করা রাজদরবার। নহবতখানায় বাজে না নহবত। দুয়োরাণী-সুয়োরাণীর দাসী-বাঁদীদের কলকণ্ঠ নেই। দাঁড়ে বাঁধা শুকসারি নেই। হাতীশাল নেই। ঘোড়াশাল নেই। কিছু নেই।

রাজপ্রাসাদের যখন এই ছিরি, তবে রাজার অবস্থা কেমন?

রাজারও ঠিক একই চেহারা।

www.pathagar.com

জরির পোশাক নেই। মোতি বসানো ইয়া বড় আলখেল্লা নেই। নেই স্বর্ণের তৈরি মুকুট, যা থেকে ঠিকরে পড়ে শত শত সূর্যরশ্মি। গলায় হীরার মালা নেই। পায়ে নেই সোনালী নাগরা। আগে-পিছে থাকে না শত শত দাস-দাসী, সান্ত্রী-সেপাই।

এ আবার কেমন রাজা? কিসের রাজা? কোন্ দেশের রাজা? এমন রাজাও আবার কোথাও আছে নাকি? সব মিথ্যা, সব গাঁজাখুরি কথা। এ ধরনের প্রশ্ন মনে উঁকি দেয়া স্বাভাবিক। রাজপ্রাসাদ নেই। বড় গোঁফওয়ালা সান্ত্রী নেই। লোক-লশ্‌কর নেই। সিংহ-দরজায় কামান নেই। ঝলমলানো রাজদরবার নেই। সিংহাসন নেই। দাস-দাসী নেই। হাতী নেই। ঘোড়া নেই। এমনকি একটি মুকুটও নেই। এমন একজন গরীব লোক কি করে রাজা হবেন! এমন লোক কি কখনো দেশের রাজা হয় !

হ্যাঁ । এমন একজন গরীব রাজা ছিলেন। আর তাঁর রাজ্যের সীমা ছিলো আধা পৃথিবী। তাঁর নাম শুনেই আশে-পাশের বড় বড় রাজারা থরথর করে কাঁপতো। তাঁর রাজ্যে ছিলো না অভাব। উঁচু-নিচু ভেদাভেদ ছিলো না। সব মানুষ ছিলো সমান। সেখানে সুখ ছিলো অফুরন্ত। হাসি খুশিতে ভরে থাকতো তাঁর রাজ্য। সব মানুষ ছিলো ভাই ভাই। হিংসা-দ্বেষ তাদের স্পর্শ করতো না কখনো।

সেই রাজার কথা। রাজ্যের কথা। রাজপ্রাসাদের কথা।

সেই রাজার ছিলো একখানা কুঁড়ে ঘর। তাতে খেজুর পাতার ছাউনি। এটাই মহাপ্রতাপশালী রাজার রাজপ্রাসাদ। এ সব শুনে মুখ টিপে টিপে হাসা যায় ঠিকই। কথাটা কিন্তু সত্যি। দিনে সেই রাজ-প্রাসাদের উঠানে খেলা করতো ঝলসানো হলদে রোদ। আর রাতে খেজুর পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোস্‌নারা খেলতো লুকোচুরি। ফুরফুরে বাতাস তার হিমেল পরশে বাজতো নহ্‌বত। সিংহাসন? খেজুর পাতার চাটাইয়ের একখানা 'সিংহাসন'। এতে

www.pathagar.com

বসেই তিনি চালাতেন তাঁর রাজ্য। ঝলমলানো ঝাড়বাতির পরিবর্তে জয়তুন তেলের একটি ছোট্ট কুপি।

ঘরে আসবাবপত্র বলতে ছিলো এই। গায়ে দেয়ার মতো ছিলো একটিমাত্র জামা। তা-ও আবার কয়েক জায়গায় ছেঁড়া, যা ধুয়ে দিলে বা কোন কারণে ভিজে গেলে শুকানোর আগ পর্যন্ত তাঁকে উদাম গায়েই থাকতে হতো। কারণ-অতিরিক্ত আর একখানা পোশাক কেনার মতো পয়সার অভাব। অনেকদিনই না খেয়ে কাটাতেন। তবু তিনি রাজা। মহাশক্তিধর রাজা। দেশের সমস্ত জনগণ তাঁর সান্ত্রী-সেপাই। আর আল্লাহ্ স্বয়ং থাকতেন এই গরীব রাজার জীবনের পাহারাদার।

কথায় কথায় আমরা অনেকটা পথই এগিয়ে এলাম। কিন্তু রাজার পরিচয় অথবা তাঁর নাম, কিছুই তো জানা হলো না। এখন আসল কথায় আসা যাক। কে এই মহাশক্তিমান রাজা? তাঁর নাম উমর ইবনে খাত্তাব (রা)। রাজ্য-আরব, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান। রাজধানী- মদীনা।

আরো একটু খোলাশা করে বলা যাক। তিনি হযরত উমর (রা), তাঁর শাসনব্যবস্থা আজো অনুকরণীয়। তিনি ছিলেন সম্রাট। তিনি ছিলেন ইসলামী খিলাফতের দ্বিতীয় খলীফা। তবু তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবন কাটিয়েছেন।

তাঁর জীবনের একটি ঘটনা। তখন তিনি খলীফার দায়িত্বে। একদিন তাঁর বেগম বললেন, - বহুদিন থেকে জয়তুন তেল দিয়ে শুকনো রুটি খেয়ে খেয়ে কেমন অরুচি ধরে গেছে। একটু মধুর যদি ব্যবস্থা করতে পারতেন...।

খলীফা বুঝলেন বেগমের মনের ব্যথা, কারণ তাঁর নিজের মনের অবস্থাও প্রায় তাই। কিন্তু কি করবেন! কোনো উপায় তো নেই। বায়তুলমাল থেকে যে ভাতা আসে, তা থেকে একটি দিরহামও বাঁচে না। একটি সাধারণ গৃহস্থ যা পায়, তিনিও তাই পান। কাজেই মধু দিয়ে রুটি খাবার সুযোগ কোথায়!

www.pathagar.com

খলীফাকে চিন্তান্বিত দেখে বেগম একটি উপায় বের করলেন। বললেন, বায়তুলমাল থেকে কয়েকটা দিরহাম ধার নিলেই তো সমস্যা মিটে যায়। খলীফা ভাবলেন, ঠিকই। ব্যাপারটি সহজ হয়ে গেলো। তিনি বায়তুলমালের পরিচালকের নিকট যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন।

কিন্তু খলীফার পুত্র বললেন, - আব্বাজান! আপনি কি আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন বলে আশা করেন?

- আগামীকাল কেন, এই মুহূর্তের পরমুহূর্তেই আমার জীবনের দশা কি হবে আমি জানি না।

- তাহলে আপনি কেমন করে ঋণ করতে পারেন?

অর্ধেক জাহানের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খলীফা উমর (রা) থর থর করে কেঁপে উঠলেন। ভাবলেন, সত্যি তো! উমর (রা)-এর জীবন আল্লাহ্‌র হাতে, আমার জীবনের কোনো এক মুহূর্তের মালিকই তো আমি নই। তাহলে আমি কেমন করে ঋণ করে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব নিতে পারি!

খলীফার আর মধু খাওয়া হলো না। খলীফা-গৃহিণীর মধু দিয়ে রুটি খাওয়ার সাধও কুঁড়ি মেলার আগেই ঝরে গেলো।

www.pathagar.com

তিনি তখনো রাজা হন নি। তবে তিনি বিরাট ধনী। টাকা-পয়সার কোনো অভাব নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। রসূল তখন জীবিত। আর তিনিই হলেন সব রাজাদের রাজা। যাঁকে এক কথায় বলা যায় রাজার রাজা।

একদিনের ঘটনা। রসূল (সা) ঘরেই ছিলেন। বাইরে বাতাস বইছে। ঝির ঝির শব্দ করে কাঁপছে খেজুর পাতা। যেনো ঘুম-পাড়ানি গান গাইছে।

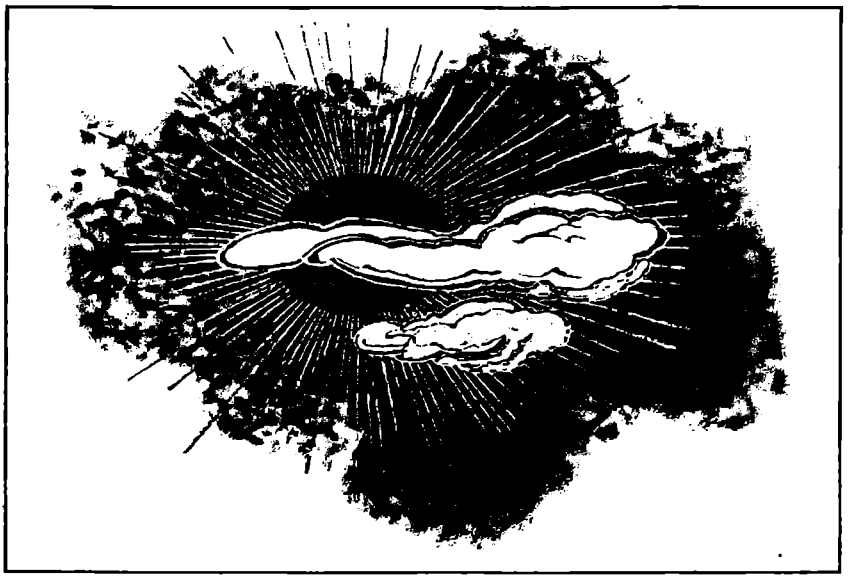

আঁধার কেটে আলো

একটি বিরাট ডিম লটকে আছে আকাশে। টুপ-টুপ করে ঝরছে জোস্‌না। আর প্রতিঘরেই জ্বলছে জয়তুনের বাতি। এশার সময় তখনো হয় নি। এমন সময় একজন আগুন্তক এলেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ। বেশ দূর থেকে তিনি এসেছেন। দূরের এক পল্লীতে তাঁর বাড়ি। তিনি রসূল (সা)-এর কাছে কিছু খাবার চাইলেন, আরজানালেন সারাদিন কোন দানা-পানি

www.pathagar.com

পড়েনি পেটে। চেহারায় একটা বিষণ্নতার ছাপ। রসূল (সা) কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, আমিও গত তিনদিন যাবত উপোস করে আছি। ঘর একেবারে শূন্য। আপনাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই। তবে হ্যাঁ, আমার মেয়ের জামাই উসমান (রা), বিরাট ধনী লোক। তাঁর কাছে আপনি যান। আমার কথা বলবেন। নিশ্চয় কিছু পাবেন। আগন্তুককে কোনোপ্রকার সাহায্য করতে না পেরে মনে খুব ব্যথা পেলন রসূল। কারণ, তাঁর কাছ থেকে তো কেউ শূন্য হাতে ফেরে নি কোনোদিন।

আগন্তুক চলে গেলেন হযরত উসমান (রা)-এর উদ্দেশে। লোকজনদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে তিনি তাঁর বাড়িতে এসে পৌছলেন। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। পা আর চলতে চায় না। কিন্তু না হেঁটে উপায় নেই। কোনো রকমে হেঁটে হেঁটে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে কাউকে ডাকবেন বলে ভাবছেন। কিন্তু এই ভাবা পর্যন্তই শেষ। তাঁর আর কাউকে ডাকা হলো না। তিনি ঘরের ভিতর হযরত উসমান (রা)-এর গলা শুনতে পেলেন। তিনি কাকে যেন ধমকাচ্ছেন আর বলছেন, তরকারিতে এত লবণ কেন দিয়েছো? লবণ কিনতে কি পয়সা লাগে না? এই লবণ নিয়ে ঘরের ভেতর এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে বলে মনে হলো।

আগন্তুকের আর কিছু চাওয়া হলো না। তিনি মনের দুঃখ মনে চেপেই ফিরে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, রসূল আমাকে এমন একজন কৃপণ লোকের কাছে পাঠালেন! যিনি নিজে এতো হিসেবী, তিনি আমাকে কি সাহায্য করতে পারেন?

সারা রাত না খেয়েই কাটালেন।

পরদিন সকাল। আবার তিনি রসূল (সা)-এর কাছে গেলেন এবং কিছু সাহায্য চাইলেন। রসূল (সা) তখন মসজিদে বসে আছেন। সকালের সোনালী রোদ তাঁর চারপাশে হলদে পাখির মতো খেলা করছিলো। চেহারায়

www.pathagar.com

ঝলমলানো এক বেহেশতী হাসি লেপটে আছে। রসূল (সা) তাঁকে বললেন, আপনি কাল উসমানের কাছে যান নি কেন?

আগন্তুক চুপ-চাপ দাঁড়িয়েছিলেন। কোনো কথা ফুটছিলো না তাঁর মুখে। তিনি কি উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। রসূল (সা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, উসমান কি কিছু দেন নি? আগন্তুক এবার গতরাতের সব ঘটনা বললেন, আপনি আবার যান, নিশ্চয় কিছু পাবেন। কারও কোনোরকম কথাবার্তার প্রতি আপনার মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই।

সন্ধ্যের পর। আবার হযরত উসমান (রা)-এর বাড়িতে গেলেন তিনি। কিন্তু আজ আরেক ঘটনা তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। কুপির সলতে বাড়িয়ে দেয়ার অপরাধে চাকর-বাকরদের খুব বকাবকি করছেন হযরত উসমান (রা)। এতে তেল বেশি খরচ হচ্ছে। এ নিয়ে খুব হৈ চৈ। আগন্তুক আর কিছু না চেয়েই বাড়ি ফিরে গেলেন। পেটের ক্ষুধায় তখন তাঁর প্রাণ যায় যায়। কি আর করবেন !

পরদিন আবার রসূল (সা)-এর কাছে গেলেন। গতকালের কথা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। রসূল (সা) সব কথা শুনলেন। লোকটার বুদ্ধিহীনতা দেখে তিনি মনে মনে বেশ দুঃখ পেলনে। রসূল (সা) বললেন, আজো আবার যান। এ-কথা ও-কথা কোনো কিছুর দিকেই আপনি খেয়াল করবেন না। যতো ঘটনাই ঘটুক, আপনি তাঁর কাছে কিছু চাইবেন।

আগন্তুক হযরত উসমান (রা)-এর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলেন না। হযরত উসমান (রা) তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলবেন কি আপনি ? তিনি তখন তাঁর অভাবের কথা বললেন এবং রসূল (সা)-এর কথাও উল্লেখ করলেন।

হযরত উসমান (রা) তাঁর সামনে দাঁড়নো একটি উটের বহরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, ওগুলো আপনি নিয়ে যান। আগন্তুক ভাবলেন,

www.pathagar.com

উসমান (রা) বুঝি ঠাট্টা করেছেন। তিনি যেমনি ছিলেন তেমনিভাবে ঠাই দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত উসমান (রা) আবার তাঁর হিসেব-পত্তরে মনোযোগ দিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখেন, লোকটি তখনো দাঁড়িয়ে। তিনি আবার বললেন, আপনি দাঁড়িয়ে কেন? উটগুলো নিয়ে যান। ওগুলো আপনার।

আগন্তুক বিস্মিত। তিনি তখন পূর্বেকার ঘটনাগুলো হযরত উসমান (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি যে হযরত উসমান (রা)-কে একজন কৃপণ লোক ভেবেছিলেন, তা-ও বললেন।

এবার হাসলেন হযরত উসমান (রা)। বললেন, আমি যদি বেশি খরচ করি, আল্লাহ্‌র কাছে আমাকে তার জবাব দিতে হবে। সে জন্যে কেউই দায়ী হবে না। আমাকেই তার শাস্তি পেতে হবে। আর আমি যতো বেশি দান করতে পারি, সে জন্যে পাবো ততো বেশি পুরস্কার। যতো দান করা যায় ততোই ভালো।

হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে আগন্তুকের সব ধারণা পালটে গেলো। চোখের সামনে তখন আঁধার কেটে কেটে আলোর রেখা ভেসে উঠলে।

www.pathagar.com

রাজ-রাজড়াদের ব্যাপার-স্যাপারই যেনো কি রকম কি রকম। রঙ-চঙে। ঘটনার পিঠে ঘটনার পাহাড়গুলো লেপটে থাকে। যেমন শরতের আকাশ। কখনো মেঘ। কখনো বৃষ্টি। আবার কখনো সুনীল উদার। যোজন যোজন উধাও প্রান্তর। এক রাজা যায় আবার আর-এক রাজা সিংহাসনে বসে। চাকার মতোই ঘুরে ঘুরে চলে রাজ - রাজড়াদের ইতিহাস। কেউ রেখে যায় কিছু কালো স্মৃতি। আবার কেউ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় গোলাপের পাপড়ির মতো কিছু স্মৃতিময় উজ্জ্বল খোশবু।

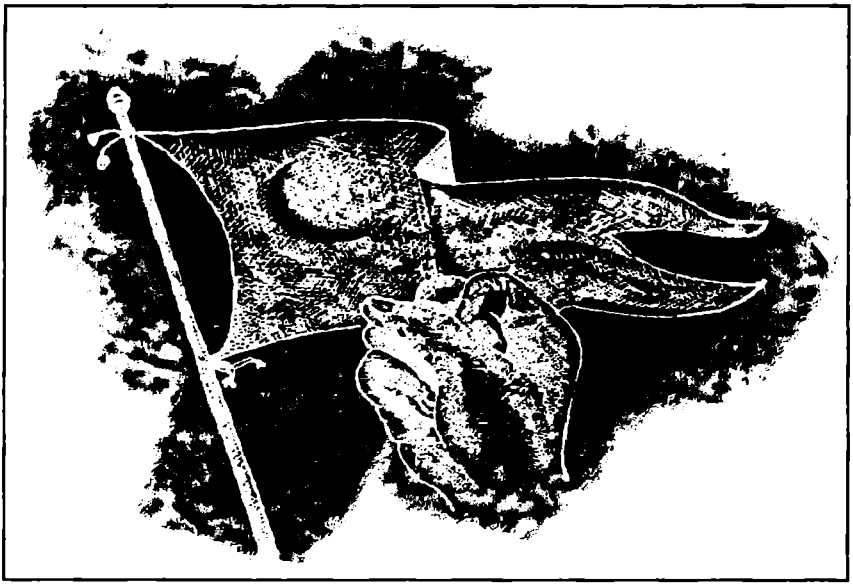

বিদ্রোহী ইমাম

ইমাম আবূ হানীফা (র)। তিনি রাজ-রাজড়াদের কেউ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর জীবনাচরণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও আদর্শপ্রেম রাজ-রাজড়াদের মর্মর সিংহাসনকে আন্দোলিত করেছিলো। সেখানে প্রবল ঢেউ তুলেছিলো।

www.pathagar.com

জন্মেছিলেন ইরাকের কূফা নগরীতে। সময়টা ৬৯৯ খৃস্টাব্দ। তখন সেখানে বইছে মরুভূমির লু হাওয়া। মানুষের মনের নদীতে অশান্তির উথাল-পাথাল ঢেউ। টেউয়ের আঘাতে খসে খসে পড়ছে শান্তির জাফরানী পাটাতন। সে দেশের সিংহাসনে তখন উমাইয়া সুলতান আবদুল মালিক। যার চকচকে তরবারির খোঁচায় উড়ে যেতো অনেক উন্নত মাথা।

ইমাম আবূ হানীফা (র) তো রাজা নন। তিনি একজন প্রজা মাত্র। তবে তাঁকে বলা যায় একজন অসামান্য প্রজা; একজন অবাধ্য প্রজা। হ্যাঁ, তিনি ছিলেন এমন একজন প্রজা, যাকে লোভ দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে, রক্তচোখে শাসিয়ে, অবশেষে- শারীরিক অত্যাচার করেও বশে আনা যায় নি। তিনি অত্যাচারী সুলতানদের ছিলেন তুখোড় সমালোচক। তখনকার সুলতানগণ সত্যের আলোকিত পথ ছেড়ে অন্ধকার পথে হাঁটছিলেন। অন্যায় অবিচারে ডুবেছিলেন। ইমাম তাদের এ অন্যায়ের বিরোধিতা করতেন। যে কারণে তাঁর মতো একজন মহাপণ্ডিতকে জীবনটাই হারাতে হয়েছিলো।

ইমাম ছিলেন একজন জ্ঞানসাধক। জ্ঞানের মহাসমুদ্রে তিনি সাঁতার কাটতেন। সেখানে হাবুডুবু খেতেন। ডুবতেন, আবার ভাসতেন। জ্ঞান-প্রাসাদের সিংহ-দরোজাগুলো তিনি খুলে খুলে দেখতেন। প্রাসাদের ভেতরকার মনি-মাণিক্যগুলো তাঁর জুব্বার ভেতর ভরে নিতেন। অবশেষে একসময় তিনি নিজেই জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র হয়ে গেলেন। তিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত অন্যায়ের সাথে আপোস করেন নি। তাঁর ন্যায়ের নিশান কখনো মাটিতে লুটোপুটি খায়নি। শিরদাঁড়া খাড়া করে পতপত করে উড়তো।

উমাইয়া আমীর ভীষণ খাপ্পা। কিছুতেই ইমামকে বসে আনা যাচ্ছে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-র সমর্থন পেলে অনেক অন্যায় কাজই তাঁর কাছে সহজ হয়ে যায়। কূফার আমীর ইমামকে প্রধান বিচারপতি করতে চাইলেন। কিন্তু ইমামের এক কথা। তিনি জুলুমবাজ শাসকের অধীনে চাকরি করবেন না। যে শাসক আল্লাহ্‌র কথা মেনে চলে না, যার কাজে সত্যের সুগন্ধি নেই, তাকে তিনি সমর্থনও করেন না। চাকরি করা তো পরের কথা। আমীর শুনলেন সে কথা। রাগে তাঁর চোখ দুটো লাল মার্বেল হয়ে গেলো। 'না, এ

www.pathagar.com

অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না। সামান্য একটা লোকের এতো বড়ো সাহস!' ইমামকে তিনি জেলে ঢোকালেন। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হলো। কিন্তু ইমাম সাহসের সমুদ্রে ডুব দিলেন। ইচ্ছার সোনালী পায়রাগুলো উড়িয়ে দিলেন। জেলখানায় তাঁকে অনাহারে-অর্ধাহারে রাখা হতো। তাঁর মাথায় দশটি করে চাবুক মারা হতো প্রতিদিন। ইমাম খুবই দুর্বল হয়ে পড়লেন। কিন্তু এর প্রতিবাদ কে করে।

বেশ কিছুদিন পর। তিনি তখনো বন্দী। ইমামকে জানানো হলো, তিনি যদি এখনো আমীরের প্রস্তাব মেনে নেন, তবে তাঁকে এ অবস্থা থেকে রেহাই দেয়া হবে। এটা আমীরের ইচ্ছা।

জ্ঞানী ইমাম একটা কূটনীতির খেলা খেললেন। তিনি আমীরের কাছে সময় চাইলেন। বুঝ-পরামর্শের ব্যাপার। তাঁকে মুক্তি দেয়া হলো বোঝাপড়ার জন্যে। ইমাম দেখলেন, এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। তাঁর হৃদয়ে সত্যের সুবাতাস তখন হুহু করে বইছে। অন্যায়ের সাথে সন্ধি, আবূ হানীফা (র)-র কাজ নয়। তিনি রাতের আঁধারে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন মক্কায়।

সূর্য অনেকবারই সাঁতার কেটে কেটে পূর্ব থেকে পশ্চিমে গেলো। ইমাম দেশে ফিরলেন।

অত্যাচারী উমাইয়াদের পতন হয়েছে। সিংহাসনে তখন আব্বসীয় সুলতান আল-মনসুর। আল-মনসুরও উমাইয়া সুলতানদের পথেই হাঁটলেন। জনগণের তখন নাভিশ্বাস। সুলতান জনগণের ইচ্ছাকে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছেন। ইমাম আবার তাঁর ন্যায়ের সবুজ নিশান দোলালেন। জনগণের হয়ে কথা বললেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন সুলতানকে। কিন্তু কে তাঁর কথা শোনে! সুলতানের হৃদয়ে তখন শয়তানের রঙমহল। সুলতান ইমামের সমর্থন চাইলেন। ইমাম বললেন, আমি আপনাকে, আপনার কাজকে সমর্থন করতে পারি না। আপনি অসত্যের পথে চলেছেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ভুলে গেছেন। তাছাড়া আপনি জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী সুলতান নির্বাচিত হন নি। আপনি আল্লাহ্‌র পথে

www.pathagar.com

আসুন, সত্যের পথে অসুন, ন্যায়ের পথে আসুন। আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবো। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা আমার কর্তব্য। কারণ আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

সুলতান মনসুরও ইমামকে প্রধান বিচারপতির পদ দিয়ে হাত করতে চাইলেন। কিন্তু ইমাম সে কথায় কান দিলেন না। কারণ তাঁর মনে ভয় ছিলো, এই দায়িত্ব গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে বিচার করা যাবে না। সুলতানের নির্দেশেই বিচারের রায় দিতে হবে। কিন্তু ইমাম তা করতে পারেন না। ইমাম বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ইমামের জবাব, 'না'। মনসুর ক্ষেপে গেলেন। তাঁর হৃদয়ের রঙিন ঘরটায় তখন শয়তানের সুদিন। ইমামকে বন্দী করা হলো। তাঁকে জেলখানার অন্ধকার ঘরে রাখা হলো। তাঁর গতর চাবুকের আঘাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেলো। তবুও ইমাম তাঁর বিশ্বাসে অটল। অসত্যের সাথে তাঁর কোনো আঁতাত নয়।

সবুজ নিশান তখনো পতপত করে উড়ছে। বইছে হিমেল বাতাস। ইমামের খাবার এবং পানীয় বন্ধ করে দিলো মনসুর। অনাহারে ইমামের শরীর ভেঙ্গে গেলো। পানি নেই, খাবার নেই। তিনি তখন মৃত্যুর দিকে হাঁটছেন। সত্যের দিকে হাঁটছেন। ন্যায়ের দিকে হাঁটছেন। মনসুর দেখলেন- ইমাম আবূ হানীফার সাহসের ক্ষুরধার তরবারি এখনও চকচক করছে। জালিম সুলতান পাগল হয়ে গেলেন। জ্ঞানের এই মহাসমুদ্রকে বিষ খাইয়ে মারলেন সুলতান আল-মনসুর। গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের মতো তাঁকেও বিষ খাওয়ানো হলো। জনগণ তা জানলো না।

ইমাম চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর কাজ? ন্যায়ের জন্যে, সত্যের জন্যে আমরাও কি তাঁর পথে হাঁটতে পারি না ?

www.pathagar.com

অনেকগুলো চোখ হুমড়ি খেয়ে পড়লো আকাশে। চোখের গুঁতোয় আকাশ ফুটো হবার যোগাড়। ফুরফুরে বাতাস। ধলাবগার পালকের মতো আকাশে ধবল মেঘ। নীলের ধার ঘেঁসে হালকা লালের ছোঁয়া। লাল-নীল আর সাদার এক বিচিত্র খেলা। সূর্যও তখন আকাশের শেষ সীমা ছুঁই ছুঁই করছে। বুঝি এখনি ডুব দেবে নীলে। আর অন্ধকারে বসে বসে কাঁদবে বোকা পৃথিবী।

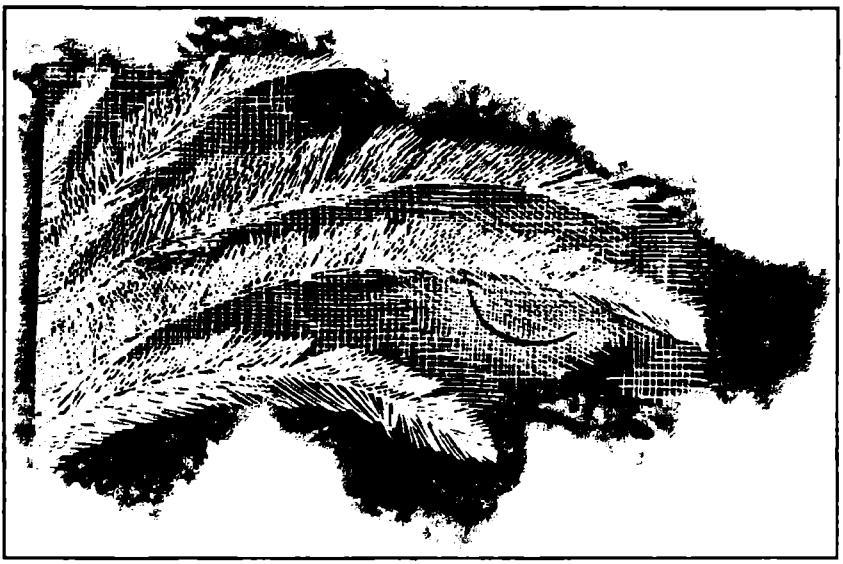

সাহসের রাঙা সুরুজ

চোখগুলো কাকে যেনো আঁতিপাতি করে খুঁজছে। একেবারে গরুখোঁজা। কিন্তু বেচারার কোন দেখা নেই। অবশেষে পাওয়া গেলো। খেজুর ডালের ফাঁক দিয়ে দেখা গেলো তাকে। লম্বা পাতাটার নিচেই লুকিয়েছিলো। লুকিয়ে

www.pathagar.com

লুকিয়ে সে হাসছে। ভাবখানা- কিছু সময়ের জন্যে সবাইকে বোকা বানিয়ে রাখা। আর

প্রতি বছরই সে এই লুকোচুরি খেলাটা খেলে। কখ নো মেঘের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, আবার কখনো গোল বটপাতার নিচে লুকিয়ে। পৃথিবীর অনেক মানুষকেই সে এভাবে বোকা বানায়। বুকের হৃদকম্পন বাড়িয়ে দেয়।

অবশেষে তাকে পাওয়া গেলো খেজুরবনে। কাকে পাওয়া গেলো ? কি পাওয়া গেলো? তাছাড়া কেনোই বা এতো খোঁজা-খুঁজি !

হ্যাঁ, অনেক খোঁজাখুঁজি করে যাকে পাওয়া গেলো, সে বেচারা হলো মউ মউ চাঁদ। অর্থাৎ ঈদের চাঁদ।

ঈদের চাঁদ আকাঙ্খিত দিনে না উঠলে তো মনটাই খারাপ হয়ে যায়। অনেককেই গোমরা মুখে ঘরে ফিরতে হয়। সেদিনের রাতটা অনেক বড় হয়ে যায়। কখন সকাল হবে। আবার কখন বিকাল হবে। তারপর ঈদের চাঁদ ভাসবে নীলের সাগরে। আর মনে বইবে আনন্দের ঢেউ। কাপড়। নতুন জুতা। নতুন টুপি। মজার মজার খাবার। মিষ্টি। আরো কত কি। জিভে পানি আসে আর কি !

এমনি এক ঈদের চাঁদ দেখা নিয়ে ঘটলো বিপত্তি। দেশের রাজা ঘোষণা করলেন, 'আগামীকাল ঈদ। ঈদের চাঁদ দেখা গেছে। কাল আর কাউকে রোযা রাখতে হবে না।' অন্যদিকে দেশের প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দিলেন, 'আগামীকাল ঈদ হবে না। কাল সবাইকে রোযা রাখতে হবে। কারণ আজ ঈদের চাঁদ দেখা যায় নি।' ব্যাপার-স্যাপার দেখে দেশের মানুষ পড়লো এক মহাফ্যাসাদে। একদিকে রাজার আদেশ, আবার অন্যদিকে দেশের প্রধান বিচারপতি অর্থাৎ কাযিয়ুল কুয্যাতের ঘোষণা।

www.pathagar.com

রাজার সাথে বেয়াদবি! রাজার মনে তখন ঔদ্ধত্যের আগুন। সে আগুনে মোসাহেবরা ঢাললো চাটুকারিতার কেরোসিন। আগুন আরো দাউ দাউ করে উঠলো জ্বলে। কাযীকে রাজসভায় ডাকা হলো। তবে সসম্মানে। রাজার মোসাহেবরা কাযীর মূল্য না বুঝলেও রাজা ঠিকই বোঝেন। কাযিয়ূল-কুয্যাত এলেন রাজসভায়। তাঁর চেহারায় খেলা করছে সাহসের রাঙা সুরুজ। তবে নম্র এবং ভদ্র। শরীরে অতি সাধারণ জামা-কাপড়।

রাজা-হে কাযিয়ুল-কুয্যাত! আপনি দেশের বিচারক, দেশের আইন আপনার জানা। আপনি রাজার আদেশ অমান্য করেছেন। রাজার আদেশের বিরুদ্ধে পাল্টা ঘোষণা জারি করেছেন। রাজার আদেশ মান্য করে চলা প্রতিটি প্রজার দায়িত্ব ও কর্তব্য। না মানার পরিণামও আপনার ভালোভাবেই জানা থাকার কথা। আপনি এ সাহস কোথা থেকে পেলেন?

কাযী- আমি পাল্টা ঘোষণা জারি করে আমার কর্তব্য পালন করেছি শুধু। একজন রাজার জন্যে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করা যায় না। দেশের ইসলামী বিধিবিধানগুলো ঠিকঠাকভাবে দেখাশোনা করার ভার আমার ওপর। রাজার জন্যে ইসলামী আইন-কানুনগুলো পালটে দেয়া যায় না। কারণ রাজা-প্রজার জন্যে আল্লাহ্‌র একই আইন। আমি আমার কর্তব্যে ফাঁকি দিতে পারি না।

রাজা-আপনার নিশ্চয় জানা আছে, দেশের শাসনকর্তার নির্দেশ পালন করাও আল্লাহ্‌র আদেশ। ইসলামের বিধান। আমার নির্দেশ অমান্য করে কি আপনি ইসলামী আইনের বিরোধিতা করেন নি ?

কাযী-যে শাসক নিজে আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলেন না, ইসলামী আইনানুসারে দেশ শাসন করেন না, সে শাসককে ইসলামী বিধানের দিকে ডেকে আনা এবং চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাঁর ভুল দেখিয়ে দেয়াই আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক

www.pathagar.com

কথা বলা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য-কর্তব্য। এটাই আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ। ইসলামের বিধান। ঈদের চাঁদ আজ দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে আমার কাছে অনেক প্রমাণ আছে। রাজা এবং রাজার মোসাহেবদের খাম-খেয়ালিপনা অন্ততঃপক্ষে আমি মেনে নিতে পারি না। আমি দেশের কাযী। আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতেই হবে। কারণ এজন্যে আল্লাহ্র কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। আমি আল্লাহ্র নির্দেশই মেনে চলবো, কোনো জালিম শাসকের নয়।

অবশেষে পতপত করে উড়লো ন্যায়ের সোনালী পতাকা। সত্যের কাছে মিথ্যার ঘটলো ভরাডুবি। ঝলমল করে উঠলো সত্যের উজ্জ্বল আলো। আলাকিত হলো জালিমের রাজদরবার। কাযিয়ূল কুয্যাতের সাহস রাজার ঔদ্ধত্যকে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে দিলো। কাযীর এই সাহস রাজার মনে নিয়ে এলো আল্লাহ্র ভয়। রাজা মেনে নিলেন কাযীর কথা।

রাজদরবার থেকে নতুন করে ঘোষণা হলো। আগামীকাল ঈদ হবে না।

www.pathagar.com

বাবা আদম শহীদ তাঁর নাম। আরবদেশে বাড়ি। তবে সে-দেশের কোন এলাকায় যে তাঁর বাপ-দাদারা বাস করতেন তা কেউ জানে না। কেউ জানে না তাঁর জন্মসাল কত। বাবার নাম মা'র নাম কি ছিলো, সে খবরও কারো কাছে

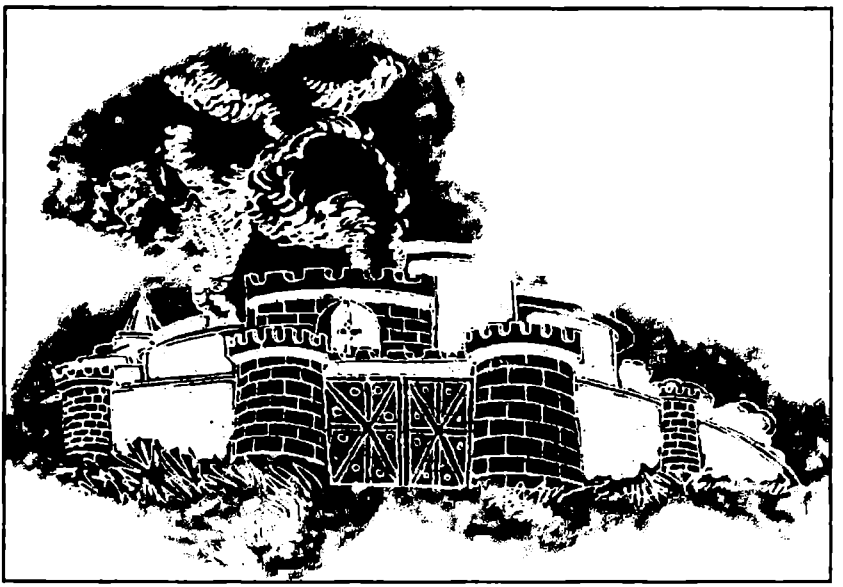

জমা নেই। কোথায় লেখাপড়া করেছেন, কোনো মহাজ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর উস্‌তাদ-এ-সব কাহিনীও কোনো বইপত্রে লেখা-টেখা নেই। বাবা আদম শহীদের ছেলেবেলার কথা, কিশোর জীবনের কথা এ দেশের কোনো ইতিহাস-লেখকই ঠিকঠাক করে বলতে পারেন নি। বলা সম্ভবও হয় নি।

অভিশাপের আগুন

www.pathagar.com

ইতিহাসের অনেক কাহিনীর দশাই এমন। আবছা কুয়াশায় থাকে ঢাকা। একটু দেখা যায় তো আর একটু ঘুমায় আঁধারে। আলো

আর আঁধারের খেলা। এ খেলাখেলিতেই কেটে কেটে হয় অনেক বেলা। তারপর যা আসে তার নাম ইতিহাস। বাবা আদম শহীদ ইতিহাসের এমনি একটি সুন্দর নাম। যে নামের গতরে ঝুলে আছে বিশ্বাসের একটি তীক্ষ্ম তলোয়ার। শক্তি সাহস আর ত্যাগের লাল সুরুজ। এ সুরুজের রশ্মি ছড়াতে ছড়াতে একদিন এসে পৌঁছলেন বাংলাদেশের ঘাসের সবুজ গালিচায়, বাবা আদম শহীদ। যোজন যোজন পথ পার হলেন। পার হলেন পাহাড়-নদী বন-জঙ্গল। ডিঙালেন কতো খাল-বিল। ইচ্ছা, এদেশের মানুষ-জনদের পথ দেখাবেন। মনের অন্ধকার খুপড়িতে সত্যের কণা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেবেন। অসত্যকে দেশ-ছাড়া করবেন। দেশ-ছাড়া করবেন জালিম শাসক।

সময় আজ থেকে প্রায় সাড়ে ন'শ বছর পেছনে। তখন এদেশে বল্লাল সেনের রাজত্ব। ঢাকার রামপাল তার রাজধানী। অর্থাৎ এখনকার বিক্রমপুর। পাল রাজবংশের শেষ শক্তিশালী রাজার নাম ছিলো রাজা রামপাল। আর তাঁর নামেই জায়গার নাম করা হলো রামপাল। রাজধানী স্থাপিত হলো সেখানে।

বল্লাল সেনের রাজত্ব। শৌর্যে-বীর্যে কমতি নেই। কমতি নেই সৈন্য-সামন্তে। রাজ্যসীমাও অনেক। সুয়োরাণী-দুয়োরাণী দাস-দাসী উজির-নাজির-সে তো আছেই। আরো আছে ফুর্তির ঢেউ। রাজবাড়ির প্রতিটি কোণায় কোণায়। ফুর্তির স্রোত যেনো। এ ফুর্তি ধন-দৌলতের। এ ফুর্তি শক্তি-সামর্থ্যের। কিন্তু গরীব প্রজাদের মনে সুখ নেই। শান্তি নেই। কারণ বল্লাল সেন তো একজন জালিম রাজার নাম। যেনতেন করেই হোক তার খাজনা চাই। টাকা চাই। পয়সা চাই। শ্রম চাই। আর তা না হলে কয়েদখানা। অথবা নায়েব-গোমস্তাদের চাবুক। যে চাবুক পিঠের চামড়া উপড়ে ফেলে। দুমড়ে দেয়। প্রজার ঘর-বাড়ি

www.pathagar.com

জ্বালিয়ে -পুড়িয়ে দেয়া বা ভেঙে-চুড়ে দেয়া সে তো মামুলি ব্যাপার। বল্লাল সেনের হুকুমে কতো মাথা যে মুহূর্তে বাতাসে উড়তো তার লেখাজোখা নেই। পান থেকে চুন খসলেই হলো। অমনি শাস্তি। বিশেষ করে রাজা বল্লাল সেনের ধর্মে যাদের বিশ্বাস ছিলো না, তাদের দুঃখের ভাণ্ড ছিলো বড়ো। সে সব দুর্ভাগা প্রজার রক্তে রাজার তলোয়ার সবসময়ই ভেজা থাকতো। রঙিন থাকতো।

সেন বংশের শেষ রাজা ছিলো রাজা লক্ষণ সেন। আর তারই বাবা বল্লাল সেন। লক্ষণ সেনের কথা যখন এসেই গেলো, তার পরিচয়টাও জেনে নেয়া যাক। বাবার পর ছেলে লক্ষণ সে সিংহাসনে বসলো। হাতে তুলে নিলো রাজ্যভার। মাথায় পরলো রাজমুকুট। তখন সময় ছিলো এগার শ' আটষট্টি। কারো মতে এর এক বছর পর। সে যাই হোক। বল্লাল সেন গেলো আর রাজার আলখেল্লায় এলো লক্ষণ সেন।

বাপ-কা-বেটা। লক্ষণ সেন। তার তলোয়ারও গরীব প্রজাদের ঘাড় লক্ষ্য করেই ওঠানামা করতো। লক্ষণ সেন তার বৌদ্ধ প্রজাদের মেরে-কেটে একেবারে দেশ ছাড়া করেছিলো। ঘর-ছাড়া করেছিলো। আর দেশের কোনা-কামছায় যে কয়জন মুসলমান প্রজা ছিলেন, তাদের দশাও হয়েছিলো বাঘের খাঁচায় ছাগের মতো। রাজ্যময় জালিম শাসকের জুলুম! জুলুম, রাজার পেয়াদা-পাইক আর মোসাহেবদের। দিন যায়, মাস যায়। প্রজাদের মনের কোঠায় জমা হয় প্রতিরোধ আর প্রতিশোধের বারুদ। কিন্তু করার কিছু নেই। জমা হওয়ার পর্যন্তই। তবে সবকিছুরই তো একটা শেষ আছে। অন্তিম সময় আছে। রাত যায়-দিন আসে। সুদিন।

সে সুদিন এক সময় এসে গেলো দুঃখী প্রজাদের দরজায়। গোপনে। প্রজারা টের পাবার আগেই ফর্সা হয়ে গেলো আকাশ। আর অন্ধকার গেলো উড়ে।

www.pathagar.com

তখন বার'শ এক সাল। তুর্কী বীর ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী এদেশের মানুষের ভাগ্যে ঝলমলে চাঁদ হয়ে উঠে এলেন। কেড়ে নিলেন জালিম লক্ষণ সেনের রাজ্য। সিংহাসন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন মাত্র সতেরজন তুর্কী বীর মুসলমান। যাদের হৃদয়ে সত্যের ধবধবে পতাকা। আর উদার নীল আকাশ। তুর্কী ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনেই লক্ষণ সেনের বুকের ছাতিতে শুরু হলো ধড়-ফড়ানি। প্রতিরোধের ভাবনা একেবারেই মুছে গেলো। বুঁজে এলো চোখ। ঠ্যাঙ কাঁপছে। কাঁপছে বুকরে ভিতর কালো কলিজা। জানের ভয়। প্রাণের ভয়। রাজবাড়ির পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলো লক্ষণ সেন। জালিম রাজা।

তারপর। ফাঁকা সিংহাসন দখলে নিলেন বখতিয়ার খিলজী। তখন রাজ্য জুড়ে নামলো শান্তির শীতল বাতাস। স্বস্তি। প্রজার ভাগ্যে ঝরঝর প্রশান্তি। চাঁদের জোস্‌না।

আর এদিকে লক্ষণ সেন পালিয়ে এলো ঢাকার রামপালে। অর্থাৎ বিক্রমপুরে। তার বাবার দেশে। একটা কথা। লক্ষণ সেন কিন্তু তার রাজধানী বানিয়েছিলো লক্ষণাবতীতে। আর দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়ায়। এ দুটো জায়গাই এখন হিন্দুস্থানের অংশ। বখতিয়ার খিলজী যখন হেলেদুলে আসছিলেন, তখন লক্ষণ সেন তার দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়ায়। সে নদীয়া থেকেই সেন বংশের শেষ রাজা পালিয়ে জানে বাঁচলো। ইতিহাসে লেখা আছে এ কাহিনী। আরো খোলামেলা করে। আরো সুন্দর করে।

রাজা বল্লাল সেনের তলোয়ার নাচানাচি করছে। আজ হাত কাটে তো কাল কাটে মাথা। প্রজারা জড়োসড়ো ভয়ে, ভাবনায়। বিশেষ করে ভিন্ন ধর্মের প্রজারা।

সেখানকার আবদুল্লাহ্‌পুরে বাস করতেন একং মুসলমান প্রজা। তাঁর আদি বসতি ছিলো আরবদেশে। কিন্তু বাংলাদেশের আকাশ নদী পাখী আর বনলতার রকম রকম চেহারা তার মনকে কামড়ে ধরলো। তিনি এদেশেই ঘর বানালেন। সংসারের দরজা খুললেন। দরজা

www.pathagar.com

খুললেন মনেরও। কিন্তু রাজার ভয় সবসময় ঘুরঘুর করে তাঁর আশে-পাশে। কি জানি। কখন কি হয়! তিনি গোপনে আল্লাহ্‌কে ডাকেন। ধর্ম-কর্ম করেন। জালিম রাজার হাত থেকে পানাহ্ চান। মুক্তি চান।

এভাবে সময় যাচ্ছিলো চলে। একে তো রাজার মেজাজ, দেশের মেজাজ দুই মন্দ। মন খুলে কথা বলা যায় না। প্রাণ খুলে ডাকা যায় না আল্লাহ্‌কে। স্রষ্টাকে। এ এক দুঃখ। তাছাড়া আরো একটা দুঃখ জড়ো হয় তাঁর মনে। সে দুঃখ সন্তানের; সুরুজ ডোবে আর আকাশের কোলে হাসে চাঁদ। কিন্তু তাঁর কোলে কিছুই হাসে না। আসে না। আল্লাহ্‌কে ডাকতে ডাকতে বেচইন হন। এমন যখন অবস্থা, একদিন তাঁর উঠানে এলেন এক ফকীর। সাহায্য চাইলেন। এতে রাগ হলো তাঁর। ফকীরকে জানিয়ে দিলেন কোনো সাহায্য কাউকে দেবেন না তিনি আর। আল্লাহ্‌কে এতো ডাকা-ডাকি, তাঁর নামে এতো দান-খয়রাত, কই তিনি তো তাঁর মনের আকাঙ্খা পূরণ করছেন না ! সাহায্য দিয়ে কি লাভ?

ফকির বুঝলেন মনের নদীতে দুঃখের ঢেউয়ের বেগ কতো। সান্ত্বনা দিলেন তাঁকে। সাথে সুসংবাদও। আল্লাহ্ তাঁর মনের আশা পূরণ করবেন। তাঁর ছেলে হবে। খুব জলদি তাঁর দুঃখের কালো পর্দা ফুটো করে সেখানে ঢুকবে আলোর সোনালী স্বপ্ন। তবে শর্ত, গরু জবাই করে সে ছেলের আকিকা দিতে হবে। আল্লাহ্‌র নামে।

ঠিক-ঠিকই একদিন তাঁর ছেলে আসে। মন থেকে দুঃখের কালো মেঘ উড়াল দেয়। খুশি আর হাসির হুল্লোড় ওঠে বাড়িময়। কিন্তু সমস্যা আকিকা। আল্লাহ্‌র নামে গরু কুরবানী। আবদুল্লাহ্‌পুরের সবটাতেই হিন্দু বসতি। তাঁর চারপাশেই হিন্দু। দেশের রাজাও তাই। তাছাড়া গরু জবাই এ রাজ্যে নিষিদ্ধ। এখন উপায়! ভাবনায় ডুব দিলেন বল্লাল রাজ্যের মজলুম মানুষটি। শেষমেশ একটা উপায় এসে ধরা দেয় তাঁর হাতে। এ কাজ সারতে হবে গোপনে। দূরে। জঙ্গলে। লোকচক্ষুর আড়ালে। তা নাহলে জান নিয়েই হবে টানাটানি। নিজেকেই তখন জবাই হতে হবে।

www.pathagar.com

জঙ্গলে গিয়েই তিনি ছেলের আকিকা সারলেন। আর প্রয়োজনমতো গোশত রেখে বাকি গোশত মাটিতে পুঁতে দিলেন, যাতে কেউ টের না পায়। হদিস না পায়।

কিন্তু নসীব মন্দ। এক টুকরা গোশত ছোঁ মেরে নিলো এক দুষ্টু চিল। হাতের খন্‌চা থেকে। আর এ গোশত নিয়ে আকাশে শুরু হলো যুদ্ধ, দুই চিলে। ঠোঁটে ঠোঁটে লড়াই। অবশেষে মারামারি থামলো। আর গোশতের টুকরাটি ছিটকে পড়লো রাজবাড়ির সিংহদরোজার কাছাকাছি।

রাজবাড়ির লোকজনদের নজরে পড়লো গোশতের টুকরা। শুরু হলো জল্পনা-কল্পনা। বড়লোকদের কায়কারবারই তো আলাদা। পরীক্ষা করে দেখা গেলো, এ গোশত আর কিছুর নয়- গরুর। স্বয়ং দেবতার। মা বলে যাকে সেবা-যত্ন করে এ রাজ্যের লোকেরা। রাজা নিজেও। কাণ্ড দেখে শিউরে উঠলো সবাই। হায় হায় রব এদিক-সেদিক।

বল্লাল সেনের কানে গিয়েও পৌঁছলো এ খবর, এক লাফে। খবর শুনে রাজার চোখের মণিতে আলতা ছড়িয়ে গেলো। অজান্তেই তলোয়ার চলে এলো খাপ থেকে হাতের মুঠোয়। তলোয়ার কাঁপছে। কাঁপছে শরীর। অপরাধের ক্ষমা নেই। ডাকা হলো মন্ত্রী। সেনাপতি। লোক-লশকর। ব্রাহ্মণ। পুরোহিত। সবাইকে। খোঁজ নিতে হবে কে এই মহাপাপিষ্ঠ। দেবতার গলায় ছুরি চালিয়ে কে এ পাপ করেছে! অমান্য করেছে রাজার আইন। রাজ্যের আইন।

রক্তের দাগ খুঁজে খুঁজে সে জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছলো রাজার চরেরা। দেখলো তারা এ বিতিকিচ্ছি কাণ্ড। কুকুর-শিয়াল টানাটানি করছে গরুর ঠ্যাঙ, মাথা। তারা নিশ্চিত হলো- রাজ্যের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। নষ্ট হয়েছে রাজার সুনাম। অভিশাপ হয়তো আসলো বলে। হায় হায়।

এ পাপকর্মের বিবরণ শুনলো বল্লাল সেন। পাপিষ্ঠের কি শাস্তি হওয়া উচিত?

www.pathagar.com

একবাক্যে সবার রায়-গর্দান নিতে হবে। এ যেনো-তেনো পাপ নয়। একেবারে দেবতার গায়ে হাত!

বল্লাল সেন এ রায়ই বহাল করলেন। যার কারণে রাজ্যে এ মহাপাপ, তার গলাও আলগা করতে হবে। সে ছেলের রক্ত দিয়েই বদলা নিতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

বাতাসে কেঁপে কেঁপে বল্লাল সেনের ঘোষণা রাজবাড়ির সিংহদরোজা পার হলো। একটা থমথমে হাওয়া রাজ্যের এ-ঘর ও-ঘরে চলাফেরা করছে। মানুষজনদের চোখে-মুখে শঙ্কা। রাজার লোক-লশ্‌কর তৈরি। আসামী পাকড়াও করতে হবে।

এদিকে মজলুম মুসলমান প্রজাটির জানালা গলিয়ে এ দুঃসংবাদ ঢুকে গেলো, শব্দহীন ঘরের ভেতরে। রাজার সৈন্য-সামান্ত আবদুল্লাহ্‌পুর পৌঁছার অনেক আগেই। তিনি দেখলেন, বিপদের কালো ঢেউ হামাগুড়ি দিয়ে আগু বাড়ছে। এ ঢেউ ভাসিয়ে নেবে তাঁর শিশু-সন্তান। কলিজার টুকরা। আর তাঁর নিজের জানও। এখানে বোকার মতো বসে থাকা মোটেও ঠিক না। এ জালিম রাজার জুলুম থেকে রেহাই পেতে হবে। যে করেই হোক।

তিনি দেশ ছাড়লেন পরিবার পরিজনসহ। সাবধানে। রাতের আঁধার আড়াল করে রাখলো এ খবর।

পথ চলতে ভয় হয়। বন-জঙ্গল আছে ! পাহাড়-পর্বত আছে। নদী-নালা আছে। আছে কতো জন্তু জানোয়ার। হিংসা যাদের বন্ধু। তাই যে কোনো মুহূর্তে-বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তবু হাঁটতে হবে। চলতে হবে দ্রুত। কারণ, এর চেয়ে বড়ো বিপদ আসছে পেছনে। আর সে বিপদ রাজা বল্লাল সেনের ঘোষণা। মৃত্যুর পরওয়ানা। ঘাড় ফেরাবার সময় নেই। সময় নেই চিন্তা-ভাবনার। চলতে চলতে একদিন পৌঁছে গেলেন ফেলে যাওয়া বাড়ি-ঘরের সীমানায়। আর তখনই পালিয়ে

www.pathagar.com

গেলো মনের খোড়ল থেকে ভয়। সামনে উদার আকাশ। প্রশান্ত মাঠ। কানাকানি নেই। খুনাখুনি নেই। হিংসা নেই। হিংস্রতা নেই। রাজা-প্রজার তফাৎ নেই।

হজ্জের মওসুম। আরবের মক্কা নগর গমগম করছে। নামছে মানুষের ঢল। স্রোতের মতো আসছে মানুষ। দুনিয়ার নানা এলাকা থেকে। হজ্জের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্‌র ঘরের উদ্দেশ্যে। মক্কায় আছে আল্লাহ্‌র ঘর। যে ঘরকে সামনে রেখে সারা দুনিয়ার মুসলমান এক হয়। কুশল বিনিময় করে নিজেদের মাঝে। আর হৃদয়ের পাপড়িগুলো মেলে ধরে আল্লাহ্‌র কাছে। কান্নাকাটি করে। মন খুলে কথা বলে। দয়া চায়। মায়া চায়। চায় আল্লাহ্‌র রহমতের শীতল পরশ। যে পরশ সুখ দেয়। দেয় স্বপ্নের সুগন্ধি।

সেই হজ্জের সময়। বাবা আদমের সাথে দেখা মুসলমান প্রজাটির, যিনি বল্লাল রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছেন। প্রাণের ভয়ে। মান-সম্মানের ভয়ে। তিনিও মক্কায় এসেছেন হজ্জের নিয়তে। এ-কথা সে-কথার পর বাবা আদম জানতে চাইলেন তাঁর কুশল। তাঁর বাড়ি-ঘরের খবরা-খবর। মুসলমান প্রজাটি তখন জানালেন তাঁর দুঃখের কাহিনী। বল্লাল রাজ্যের বিবরণ। মেলে ধরলেন বল্লাল সেনের জুলুমবাজির ভয়াল ফর্দ, বাবা আদমের কাছে। ভিন ধর্মের প্রতি বল্লাল সেনের বেরহম দিলের কথা বর্ণনা করলেন। বিশেষ করে বললেন মুসলমান প্রজাদের প্রতি রাজার অত্যাচার-অবিচারের কথা।

বাবা আদম শুনলেন সেই দুঃখের কাহিনী। তাঁর মন গলে গলে পড়ছে। অগ্নিগিরির লাভার মতো। গরম। ধোঁয়াটে।

এ অবিচারের প্রতিকার চাই। প্রতিশোধ চাই। এমন দেশও আছে দুনিয়ায় !

বাবা আদমের বিশ্বাস হয় না।

www.pathagar.com

মুসলমান তার আল্লাহ্‌কে মন খুলে ডাকতে পারে না ! ধর্ম-কর্ম করতে ভয় পায় ! ভয় পায় সত্যের জায়নামাযে পা রাখতে !

না, এ হতে পারে না। এর কালচে পালক ছিঁড়তে হবে। তিনি মনস্থির করলেন।

হজ্জের পর। বাবা আদম তাঁর জাহাজের মাস্তুল খাড়া করলেন। ঠিকঠাক করে নিলেন বৈঠা। পাটাতন। ছৈ। এক সময় উড়িয়ে দিলেন পাল, আল্লাহ্‌র নামে। ঢেউয়ের রূপালী দেয়াল ভেঙে ভেঙে আগু বাড়ছে জাহাজ। কতো পাহাড়, কতো পর্বত-নগর জনপদ ছবির মতো চলে যাচ্ছে পেছনে; ঢেউয়ের ছলাত ছলাত শব্দে। জালিম বল্লাল সেনের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে। দেখতে হবে তার হাতের কব্‌জিতে কত তাকত। তাঁর মনের এক কোণায় প্রতিশোধের আগুন, জ্বলছে দাউ দাউ। আর অন্য কোণায় জমা অত্যাচারিত মানুষজনদের জন্যে সত্যের সুসংবাদ। বসরাই গোলাপের সুগন্ধি।

অথই সাগর পাড়ি দিয়ে বাবা আদম এবং তাঁর সঙ্গী- সাথীরা একদিন পৌঁছলেন এসে বল্লাল সেনের রাজ্য-সীমায়। ভাটি মুল্লুকে। এ-পথ ও-পথের বাঁক ঘুরে ঘুরে রাজধানী বিক্রমপুরে হাযির হলেন অবশেষে, বাবা আদম। দল-বলসহ। শিষ্য-শাগরিদসহ। আস্তানা গাড়লেন একটা টিলার মতোন জায়গায়। সারি সারি তাঁবু পাতা হলো সেনাছাউনির মতো। আসলে প্রতিটি মুসলমানই তো এক-একজন সত্যের সৈনিক। বাবা আদম এবং তাঁর সাথীরাও ছিলেন তাই। ঢাল-তলোয়ার নেযা-গুর্জ সবই আছে তাঁদের। সবচে' বড় যে অস্ত্রটি তাঁরা সঙ্গে করে এনেছেন তা হলো তাঁদের বিশ্বাস। এক আল্লাহ্‌র বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের নিশান উড়ছে শিবিরের চূড়ায়। দুলছে হাওয়ায় হাওয়ায়। ভাবখানা এমন যে, বল্লাল সেন এসো এক হাত হয়ে যাক।

প্রতি ওয়াক্তে নামাযে কাতারবন্দি হচ্ছে। বাতাসে ভর করে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে আযানের দরদী বাণী। রাজপ্রাসাদের দেয়াল

www.pathagar.com

কাঁপছে। কাঁপছে রাজার কলিজাও। আল্লাহু আকবর শব্দের গমকে। গরু জবাই করে চলছে খানাপিনা। বিদেশীদের এ-সব কায়কারবারের খবর চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। রাজার কানে যায়।

বল্লাল সেনের রাজত্বে এ অনাচার! ঐ ঔদ্ধত্যের একটা বিহিত করতে হবে। চোখের মণিতে আলতাগুলো আরো লাল হয়, বল্লাল সেনের। আবার একটা অজানা ভয়ও মনের কোণায় উকি দেয়। মুসলমানদের শক্তি-সাহস তার অজানা নয়। জানা আছে তাদের বিশ্বাসের খবরও। তবু একটা কিছু করতে হবে। মান-সম্মানের প্রশ্ন। বল্লাল সেনের কতো নাম-ডাক! আর সে কিনা সামান্য ক'জন বিদেশীর ভয়ে ভীত!

অনেক ভেবেচিন্তে দূত পাঠানো হলো মুসলমানদের শিবিরে, বাবা আদমের কাছে। তাদেরকে জানানো হলো শিবির গোটাতে হবে। চলে যেতে হবে এ রাজ্য ছেড়ে, এখুনি। রাজার হুকুম। বল্লাল সেনের আদেশ। আর তা না হলে শাস্তি। কঠোর শাস্তি।

'আমরা এ দেশে থাকতে এসেছি, যেতে নয়। মুসলমান এক আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করে না। এ বিশ্ব জাহানের মালিক আল্লাহ্। এখানে কোনো মানুষের একক অধিকার নেই। আর মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর রসূল। মুসলমানদের একমাত্র নেতা। তাঁর পিছনেই তারা কাতারবন্দি হয়। জীবনেও; মরণেও। এদেশের মানুষ-জনদের হৃদয়ে এ সুবাতাসটা গেঁথে দেয়ার জন্যেই আমরা এসেছি। সুদূর আরব থেকে। পাহাড়-পর্বত আর সাগরের রাক্ষুসে ঢেউ আমাদের রুখতে পারেনি।

বল্লাল সেনেরও উচিত এ সত্যটায় ঈমান আনা; যে বিশ্বাসে পৃথিবীর মানুষের সুখ-শান্তি। তা না হলে মুসলমান শক্তির মুকাবিলা শক্তি দিয়ে করে থাকে। তোমাদের রাজাকে জানিয়ে দাও এ সংবাদ।

বাবা আদমের সাফ জবাব।

রাজদূত ফিরে এলো। সাথে বল্লাল সেনের জন্যে দুঃসংবাদের পুঁটলি। সামান্য ক'জন বিদেশীর সাহস বিক্রমপুরের রাজাকে বেদিশা

www.pathagar.com

করে তুললো। দিশেহারা রাজা যুদ্ধের হুকুম জারি করলো। শুরু হলো শক্তি-পরীক্ষার মহড়া। দু'পক্ষে। বাবা আদমও ছিলেন তৈরি। তিনি তো আগেই জানতেন অবস্থা কি হতে পারে। ঢাল, তলোয়ার আর নেযার বিকট ও ঝনঝন আওয়াজ। ঘোড়ার খুরের আঘাতে উড়ছে মাটি। উড়ছে ঘাসের ছেঁড়া পাতা। বইছে রক্তের বান। বাতাসের কান ঘেঁসে ছুটছে তীরের বিষমাখা ফলা। আর সাথে জখমী মানুষের হা-হুতাশ।

যুদ্ধ চলছে। এক-দুই করে চৌদ্দটা রাত কালের বাক্সে ঘুমিয়ে গেলো। কিন্তু কোন রফা নেই, দফা নেই। বল্লাল সেনের সেনাপতির কাহিল অবস্থা। তার সৈন্যদেরও একই হালত। মান-সম্মান বুঝি গেলো। শেষ পর্যন্ত চাকরিটাও থাকে কিনা কে জানে! বল্লাল সেনের সেনাপতির মনে আরো ধুসর ভাবনা ফুলে ফুলে উঠছে। তার প্রতিটি আঘাতই তুলার মতো উড়িয়ে দিচ্ছে বাবা আদমের সেনারা। বার বার পরাজয়! ভয় আর হতাশার ঢেউ মনের প্রতিটি কোণায়। রাজপ্রসাদে পৌঁছলো এ খবর। পরাজয়ের খবর।

রাজার চোখও কপালে। বেগতিক অবস্থা। সময় খরচ করা আহম্মকি। কারণ অপদার্থ সেনাপতির উপর ভরসা করলে সব শেষ। মান-ইজ্জত, রাজ্য-এমনকি জীবনও।

বল্লাল সেন নিজেই যুদ্ধে নামলো। ঘোড়া হাঁকিয়ে গেলো ময়দানে। কিন্তু তার মনে তো ভয়েরা লাফালাফি করছে। বিপক্ষ দল মুসলমান। বল্লাল সেন শুনেছে তারা অজেয়। বলা তো যায় না আপদ-বিপদের কথা। তাই ময়দানে নামার আগেই পোশাকের বুকের ভেতর দু'টি কবুতর লুকিয়ে নিলো যত্ন করে, আর রাজপ্রাসাদের ভেতর তৈরি করে গেলো একটি অগ্নিকুণ্ড। যাতে আগুন দিলেই জ্বলে উঠবে দাউ দাউ। যুদ্ধের যা অবস্থা। বিপদের হাত-পা নেই। কথা থাকলো, যদি কোনো বিপদ ঘটে, তবে বুক-পকেটের কবুতর দু'টি ছেড়ে দেয়া হবে। তারা উড়ে আসবে পরাজয়ের বার্তা নিয়ে। তখন রাজবাড়ির সবাই যেনো শত্রুসেনাদের হাতে পাকড়াও হবার আগেই কুণ্ডুলিতে আগুন জ্বালিয়ে

www.pathagar.com

সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশেষ করে রাজবাড়ির মহিলাদের প্রতি নির্দেশ থাকলো কড়া। সেন রাজাদের তো একটা মান-সম্মান আছে। জাতপাতের বালাই আছে। তারা বড়ো জাতের মানুষ। মুসলমানদের ছোঁয়া লাগলে জাত নষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা। মনের কোণায় জমা এই বিশ্বাস। তাই জাত নষ্ট হবার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। বল্লাল সেন রাজ-প্রাসাদে রাজবংশের জাত বাঁচাবার ব্যবস্থা করে যুদ্ধযাত্রা করলো।

রাজা এসেছে যুদ্ধের ময়দানে। সৈন্যদের মনে নতুন উৎসাহ। হাতের অস্ত্র ঠিকঠাক করে নিলো তারা। তারপর, শক্তি আর সাহস জড়ো করে হামলা করলো বাবা আদমের শিবিরে। বল্লাল সেনের কারণে যুদ্ধের চেহারাই হয়ে গেলো অন্যরকম।

যুদ্ধ চলছে। ভীষণ যুদ্ধ। কাটাকাটি। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ। কিন্তু এক-এক করে শহীদ হয়ে যাচ্ছেন বাবা আদমের সহযোদ্ধারা। বাবা আদমের শক্তি কমছে। কমছে সঙ্গী-সাথীরা। যুদ্ধ করতে করতে এক সময় শহীদ হয়ে গেলেন সবাই। ময়দানে কেবল বাবা আদম একা। তিনি দেখলেন, তাঁর জীবনের শেষ সময় এসে গেছে। আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা প্রয়োজন। প্রয়োজন শেষবারের মতো তাঁর কাছে সব গুনাহ্‌র মাপ চাওয়া। জীবনের সময় তো আর বেশি নেই। বাবা আদম তাঁর জীবনের শেষ নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ময়দানের এক কোণায় কেবলামুখি হলেন।

এদিকে বল্লাল সেন যুদ্ধজয়ের উল্লাসে পাগলপ্রায়। খুশির শোঁ শোঁ বাতাস তার শরীরে এবং মনে। আর বাবা আদমের প্রতি বিদ্বেষের তুফান চোখে-মুখে। বল্লাল সেনের তলোয়ার আঘাত হানলো বাবা আদমের শরীরে। কিন্তু এতে কিছুই হলো না। তলোয়ার ফিরে এলো। বাবা আদমের শরীরে কোন আঁচড়ও বসলো না। আল্লাহ্‌র রহমতে এ অলৌকি কাণ্ড ঘটলো। নামায শেষ করলেন বাবা আদম। তারপর মুখোমুখি হলেন জালিম রাজার। প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি আমার নামাযে অসুবিধা করছো বারবার?'

www.pathagar.com

'আমার জাতি এবং আমি নিজে যাকে পবিত্র মনে করি, মায়ের মতো ভালোবাসি, পূজা করি; যারা তাকে আপমান করেছে, হত্যা করেছে, আমি তার বদলা নিতে এসেছি। আমি বল্লাল সেন। এদেশের রাজা।' জবাব দিলো জালিম রাজা।

বাবা আদম বললেন- 'তোমার হাতেই আমার মরণ। এটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তবে কোনো অবিশ্বাসীর অস্ত্র আমার শরীরে কোনো দাগও বসাতে পারবে না। এই নাও আমার তলোয়ার। আমাকে হত্যা করো।'

সহযোদ্ধাদের লাশের দিকে একবার দেখে নিলেন। চোখের কোণে মুক্তার কণাগুলো টলমল করছে। টলমল করছে হৃদয়ে দরদের নদী। তারপর বাবা আদম চিৎকার করে বললেন- 'বল্লাল সেন, তোমার উপর আল্লাহ্‌র গযব তুফানের মতো ধেয়ে আসছে। তুমি তৈরি হও।'

তলোয়ার হাতে পেয়ে বল্লাল সেনের আর তর সইছিলো না। এক কোপে বাবা আদমের মাথা শরীর থেকে আলাদা করে ফেললো। বাবা আদম শহীদ হলেন জালিম রাজা বল্লাল সেনের হাতে। এরপর থেকেই বাবা আদমের নামের সাথে শহীদ কথাটি যোগ করে তাঁর নাম লেখা হয় বাবা আদম শহীদ। এ সুন্দর কাজটি করেছেন আমাদের জ্ঞানী-গুণীরা। কারণ বাবা আদম বলতে আমরা আমাদের আদি পিতাকেই বুঝি। তাই শহীদ শব্দটি জোড়া দিয়ে আমাদেরকে ভুলচুকের হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন তাঁরা। দু'জন যে আলাদা আলাদা মানুষ, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যদিও ভুল হবার কথা নয় কারো। তবু বলা তো যায় না।

যুদ্ধজয়ের আনন্দে বল্লাল সেন দিশেহারা। খুশির পাপড়িগুলো ঝুরঝুর করে ঝরছে। অজেয় সৈনিকরা তার হাতে পরাজিত। শুধু পরাজিতই নয়- একেবারে সব শেষ।

শত্রুর আর কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। আনন্দ কার না হয় !

এ আনন্দই তার কাল হলো।

www.pathagar.com

হাতে-মুখে রক্তের দাগ। ধোয়া-মোছা দরকার। পাশের নদীতে নামলো বল্লাল সেন। পানির ঝাপটায় সাফ করে নিলো সব। কিন্তু এদিকে ঘটলো অঘটন। কবুতর দু'টি কখন যে উড়ে গেছে আলখেল্লার খুপড়ি থেকে, বল্লাল সেন টেরও পায় নি। রাজার আনন্দের বেলুন চুপসে গেলো। মাথা ঘুরছে। ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের নজর। হয়তো এতো সময়ে রাজপ্রাসাদে সব জ্বলেপুড়ে কয়লা হবার জোগাড়। বল্লাল সেন পাগলের মতো ঘোড়া ছুটালো রাজপ্রাসাদের দিকে।

ততোক্ষণে কবুতর দুটি উড়তে উড়তে রাজবাড়িতে গিয়ে হাযির। কবুতর দেখে রাজপ্রাসাদে হায় হায় রব। এই বুঝি এসে পড়লো মুসলিম সেনারা। ভয় এবং শঙ্কা। জাতকূল বুঝি আর রাখা গেলো না। রাজার নির্দেশমতো আগুন দেয়া হলো কুণ্ডুলিতে। এ জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজবাড়ির ছেলে- বুড়ো নারী-পুরুষ সব। মহিলারা তো সবার আগেই ঝাঁপ দিলো আগুনে।

বল্লাল সেন দূর থেকেই দেখলো রাজবাড়ির আগুন। যে আগুনে তার বংশ জ্বলছে। জ্বলছে তার অহঙ্কার। মনের দুঃখে বল্লাল সেন নিজেও ঝাপ দিলো তার নিজের তৈরি অগ্নিকুণ্ডুলিতে।

বাবা আদমের অভিশাপের আগুন জালিম বল্লাল সেনকে পুড়ে পুড়ে কয়লা বানিয়ে ফেললো।

আসলে জুলুমবাজদের ঔদ্ধত্য এভাবেই আল্লাহ্ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে সাফ করে দেন। যেভাবে বল্লাল সেনের সব বাহাদুরি ছাই করে দিলেন মুহূর্তে।

এখনো বল্লাল সেনের ভাঙা রাজপ্রসাদ আছে রামপালে। এলাকার লোকজনেরা বলে, পোড়া রাজার বাড়ি। আবদুল্লাহ্পুর গ্রামে আছে বাবা আদম শহীদের কবর। আর বাজারের কাছে আছে আদম শহীদ মসজিদ। মসজিদটি এখন যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক সে জায়গাটিতেই বাবা আদম শহীদ আর বল্লাল সেনের সৈন্যরা মুখোমুখি হয়েছিলো।

www.pathagar.com

কালো একখণ্ড মেঘ যেমন দেখতে দেখতে সমস্ত নীল আকাশটাই দাঁড়কাকের পালক বানিয়ে দেয়, বাংলার ভাগ্য আকাশের রঙটাও যেনো বদলে গেলো এমনি করে, এক সময়। কালো পালক আড়াল করে দাঁড়ালো সোনা-রঙ রোদ। আর এ সুযোগে মেঘ তার ঝড়-ঝাপটায় এলোমেলো করে দিলো চলার গতি। এখানে - সেখানে জমা হলো পানিকাদা। রোদের অভাবে পঁচা-গন্ধ কাদাপানিতে মাখামাখি হলো।

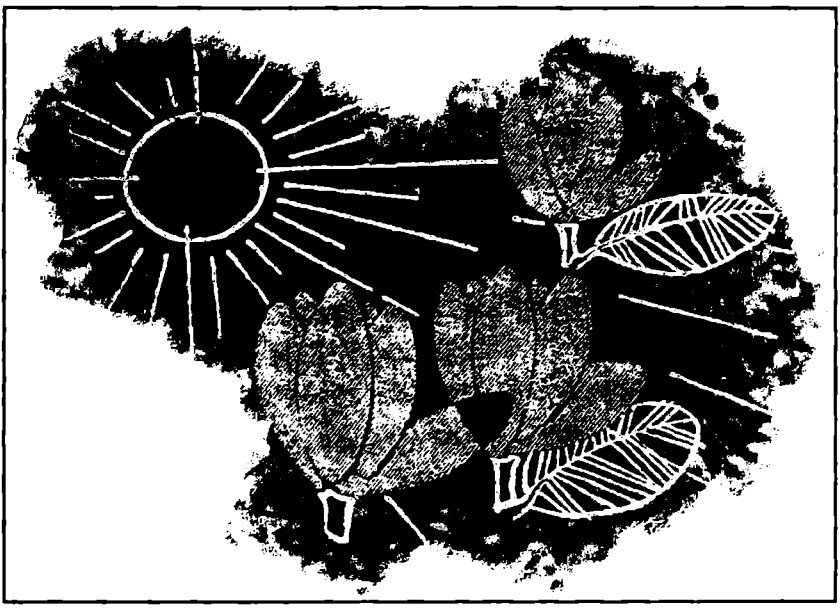

চম্পা ফুলের পাপড়ি

ইংরেজি চৌদ্দশ' চৌদ্দ সালের কথা। গণেশ বাংলা মুল্লুকের সিংহাসন দখলে নিয়েছে। তার নামের আগে রাজা শব্দটা বসিয়ে দিয়েছে। রাজা কংশ নামেও যার পরিচয় ইতিহাসে।

www.pathagar.com

তখন এ সিংহাসনে ছিলেন ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ সুলতান আলাউদ্দীন ফীরূয শাহ। দেশের মানুষের জন্যে তাঁর হৃদয়ের কপাট সব-সময়ই খোলা থাকতো। সুখে-দুঃখে। যোজন-যোজন ব্যাপী ছিলো তাঁর মনের উঠান। সে উঠানে খেলতো খাসি-খুশির লাল-নীল পাখিরা। ফীরূয শাহ্‌র খোলা-মেলা মনই কাল হলো। সিংহাসন গেলো। রাজ্য গেলো।

অন্ধকারে হাঁটাহাঁটি ছিলো গণেশের পুরোনো অভ্যাস। এক সময় ভাতুরিয়ার সামান্য একজন জমিদার ছিলো এ গণেশ। ভাতুরিয়া জায়গাটা ছিলো দিনাজপুর এলাকায়। তার কুটিল বুদ্ধি তাকে রাজা বানিয়ে দিলো। বাংলার সিংহাসন তার হাতের মুঠোয় এনে দিলো। তারই ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহও। তখন সময় চৌদ্দ শ' দশ সাল।

তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারক। এ নিয়ে অনেক কিসসা কাহিনী আছে তাঁর নামে। সুলতান হলে কি হবে, গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ ছিলেন গরীবের আপনজন। সুখে-দুঃখে তাদের পাশাপাশি হেঁটেছেন তিনি। যে জন্যে তাঁর নাম সোনার হরফে লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়। এমন একজন ভালো মানুষ খুন হলেন গণেশের চালবাজিতে। যদিও এ গনেশকে ইলিয়াসশাহী রাজ-দরবারে ঠাঁই দিয়েছিলেন আযম শাহ্‌ই। সে ছিলো দরবারের একজন আমাত্য। অর্থাৎ মন্ত্রী।

ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ ছিলেন বড়ো বেশি উদার। এমনি আরো অনেক গণেশকেই কাছে টেনে এনেছিলেন তাঁরা। বিশ্বাসে আলাদা। আচারে-ব্যবহারে আলাদা। ভাষায়ও আলাদা। তবু তাদেরকে তাঁরা বুকে টেনে এনেছিলেন। আপন করতে চেয়ে-ছিলেন। ভেবেছিলেন মিলেমিশে দেশ চালাবেন। দেশের মানুষের সুখ-শান্তি দেখবেন। কারণ তাঁরা তো দূর দেশ থেকে এসেছেন। তাই দরকার এদেশী লোক। যারা সুলতানদের আশা-আকাঙ্খা রাজ্যের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে।

www.pathagar.com

আদতে মুসলমানদের বিশ্বাসটাই অন্যরকম। বুকের সবক'টা জানালা ফট্‌ফট্‌ করে খুলে দেয়। ধনী-গরীব সবাইকে এক কাতারে খাড়া করে। আর অন্য বিশ্বাসের মানুষজনদের প্রতি থাকে রহমদিল। ইলিয়াসশাহী সব সুলতানগণও ছিলেন তাই। কিন্তু সুলতানদের এ উদারতার ফল হলো উল্টা। গণেশ বিশ্বাসের ঘরে আগুন দিলো। যে আগুন ছাই করলো অনেক সুনীল স্বপ্ন। অনেক আশা-ভরসার মনোরম প্রাসাদ।

মাটির পুতুলকে যারা ভালোবাসে, এর কাছে মাথা নত করে, তাদের ভেতরটায় বুঝি সব সময়ই থাকে অন্ধকার। সেঁত-সেঁতে। সেখানে আলো হাসে না। সত্য তার সৌরভ ছড়ায় না। তাই এ অন্ধকারে জন্ম নেয় মানুষের অমঙ্গল। দুনিয়া জাহানের জন্যেও অমঙ্গল। গণেশের মনও রাতদিন কালোতেই হাবুডুবু খেতো। যে কারণে মনিবের ক্ষতি করতে তার হৃদয় এতটুকুও কাঁপে নি। কাঁপার কথাও না। সত্য যাদের সাথী নয়, তারা এমনি হয়। সুলতানদের বিরুদ্ধে কুপরামর্শের মধ্যমণি ছিলো এ গণেশ। শেষমেশ এ পথেই সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে গেলো সে।

খারাপ লোকেরা যা করে, সিংহাসনে বসে গণেশও তাই করলো। সে ঠিক করলো, এ দেশ থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে দিতে হবে। কারণ তার সব গোমর ফাঁক। আসল চেহারা খোলাশা হয়ে গেছে মুসলমানদের কাছে। তাছাড়া সিংহাসনের মালিকও তো মুসলমানরা। এদেরকে ঠিকঠাক রাখলেই বিপদ। প্রথমেই গণেশের নজর গেলো আলেম তথা মুসলমানদের যারা নেতা-পথের দিশারী- তাদের দিকে। সে বুঝতে পেরেছিলো তারাই তার মূল বাধা। এ বাধা দূর করা প্রয়োজন। তাই সারাদেশ থেকে আলেমদেরকে গ্রেফতার করে আনা হলো। তারপর নৌকা বোঝাই করে গভীর নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে দিলো।

www.pathagar.com

শায়খ বদরুল ইসলামের গলা আলাদা করে দিলো এক কোপে। তাঁর অপরাধ, তিনি গণেশকে মাথা নত করে সালাম জানান নি। তিনি কি করে এ কাজ করবেন ? একজন মুসলমান তো কেবলমাত্র তার সৃষ্টিকর্তার কাছেই মাথা নত করতে পারে। কোনো মানুষের কাছে নয়। সে যে কেউ হোক না ! আর গণেশ তো একজন অত্যাচারী। যার হাঁটাচলা অন্ধকারে। এমন মানুষের মুখের উপর হক কথা বলা তো তাঁর দায়িত্ব। কর্তব্যও। এটা আল্লাহ্‌র হুকুম। আল্লাহ্‌র রসূলের নির্দেশ। শায়খ বদরুল ইসলাম কর্তব্য পালন করেছিলেন মাত্র। গণেশ তাঁর এ আচরণকে মনে করেছে বেয়াদবি। কারণ সে এখন রাজা। তাই তাঁকে হত্যা করে এর শাস্তি দিয়েছে।

এভাবে গণেশের অত্যাচার চরমে উঠলো। সবুরের সবুজ বাঁধগুলো এক-এক করে ভেঙে গেলো। তখন নূর কুত্‌বুল আলম মাথা তুললেন। গণেশকে সাবধান করে দিলেন। আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা তাকে শুনালেন। কিন্তু রাজা গণেশ এসব কথায় কান দিলো না। সে তার হিংসার লক্‌লকে চাবুক আরো লাল করলো।

নূর কুত্‌বুল আলম ছিলেন জ্ঞানের সায়র ! তিনি জ্ঞানের সাধনা করতেন। যে জ্ঞানের জমিনে সত্যের সবুজ নিশান ফরফর করে ওড়ে। সাথে সাথে তিনি ছিলেন নেতাও। দেশ ও দশের। বাংলার দুঃখী মানুষদের বিপদ-আপদকে বুকের শক্ত দেয়ালে ঠেকিয়ে রাখতেন। তাদের দুর্দিনে তিনি ছিলেন বিশাল বটগাছের মতো। যার তলায় জড়ো হতো সবাই। ছায়া এবং উম উম বাতাসের আশায়। তিনি কাউকে নিরাশ করেন নি। জান বাজি রেখেও।

নূর কুত্‌বুল আলম জন্মেছিলেন পাণ্ডুয়ায়। শাহ আহমদ নূর কুত্‌বুল আলম তাঁর পুরা নাম। আব্বা ছিলেন শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক। তিনিও জ্ঞানের উঁচা উঁচা পাহাড়-পর্বত থেকে মধুমাখা রস শুঁষে

www.pathagar.com

এনেছিলেন। যে রসে ভেজা ছিলো নূর কুত্‌বুল আলমের সারা গতর এবং মন।

দাদা ছিলেন উমর ইবনে আসাদ খালেদী। তিনিই প্রথম পা রাখেন বাংলার কচি কচি ঘাসের ডগায়। এসেছিলেন লাহোর থেকে। লাহোর এলাকাটা এখন পাকিস্তানের একটা নামকরা শহর। তিনি এসেছিলেন কাজ-কামের আশায়। ভাগ্যের আকাশকে ফক্‌ফকে করার আশায়। নিরাশ হন নি। সে আকাশে সোনালী চাঁদ ঝলমল করে হেসেছিলো। তিনি সুলতান সিকানদার শাহ্‌র দরবারে বড়োসড়ো একটা কাজ পেয়েছিলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশে ঘরবাড়ি বানিয়েছিলেন। ধান আর সর্ষেফুলের সাথে দোস্তি করেছিলেন। সে থেকেই তাঁদের বাংলার মানুষের সাথে ওঠা-বসা। সময়ে- অসময়ে গলাগলি করা।

আসলে নূর কুত্‌বুল আলমের আদি পুরুষরা ছিলেন আরবের মানুষ। মহাবীর খালিদ বিন ওলীদ ছিলেন এ বংশের ঝলমলে তারা। যাঁর তলোয়ারের খোঁচায় অসত্য আর জুলুমবাজের মাথা উড়তো বাতাসে। চৈত্রের শুকনো পাতার মতো। কতো বড়ো বড়ো লড়াইয়ে খালিদ বিন ওলীদ তাঁর সাহসের সবুজ নিশান আকাশে উড়িয়েছেন। দেশের পর দেশ সত্যের শীতল ছায়ায় জড়ো করেছেন। এ-জন্যে তাঁকে বলা হতো সায়ফুল্লাহ্‌। যার অর্থ-আল্লাহ্‌র তরবারি। সে তরবারির তেজি ঢেউ নূর কুত্‌বুল আলমের রক্তেও ওঠা-নামা করতো।

ধন-দওলতের অভাব নেই। কারণ রাজ-রাজড়াদের সাথে ওঠাবসা। চলাফেরা। তবু আব্বার ইচ্ছা- ছেলেকে একজন খাঁটি মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। লোভ-লালসা থেকে দূরে রাখবেন। যে পথ শায়খ আলাউল হকও পার হয়ে এসেছেন। নিজেকে বানিয়েছেন মানুষের আপজন। সত্যের সোনালী বাক্যগুলো গেঁথে রেখেছেন বুকের নরম দেয়ালে। তাও মানুষের জন্যে। তাদের ভালো-মন্দের জন্যে। ছেলে নূর কুত্‌বুল আলমকে এভাবে গড়বেন ইচ্ছা করলেন। করলেনও

www.pathagar.com

তাই। তাঁর ছিলো একটি খান্‌কাহ। যার অধীনে ছিলো মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা, লঙ্গরখানা ইত্যাদি।

একটি লঙ্গরখানা দেখাশোনোর ভার দিলেন বালক নূর কুত্‌বুল আলমকে। সেখানে কাজ ছিলো হাজার কিসিমের। তাই খাটা-খাটনির শেষ ছিলো না। মুসাফিরদের খাওয়া-দাওয়া, রান্নাবান্না, বাজার, পাক-সাকের জন্য জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনা- এর সব ক'টাই বালক নূর কুত্‌বুল আলমকে সামলাতে হতো। একা একা। এমনকি মুসাফিরদের জামা কাপড় কেঁচে দেয়া এবং তাদের ওযুর পানি ঢেলে দিতে হতো তাঁকে। মুসাফিরদের যেনো এতটুকু কষ্ট না হয়, সে ব্যাপারেও ছিলো কড়া হুকুম। এ হুকুম ঠিকঠাক মতো পালন করতেন তিনি। লঙ্গরখানার উঠান পরিস্কার রাখা ছাড়াও এর মেঝে পানি দিয়ে রোজ সাফ করা ছিলো বালক নূর কুত্‌বুল আলমের প্রতিদিনের কাজ।

এখানেই শেষ না। লঙ্গরখানার পায়খানা-পেশাবখানা পাক-সাফ করতেন নিজ হাতে। যেনো কোনোভাবেই মুসাফিরদের অসুবিধা না হয়। কষ্ট না হয়। এতো যে কাজ তবু বালক নূর কুত্‌বুল আলমের ঠোঁটে হাসির ঝিলিক লটকে থাকতো। সারাক্ষণ। সতেজ থাকতো গতর। মন। আর চোখের নীল তারায় বিনয়ের গন্ধমাখা গোলাপ। জীবনের শুরুতেই তিনি কষ্টের কাঁটাওয়ালা পথ কেটে কেটে সেখানে মুক্তির সোনালী সিঁড়ি বসিয়েছিলেন। নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন একজন খাঁটি মানুষ হিসেবে। বড়ো কথা একজন মুসলমান হিসেবে। আল্লাহ্‌র কাছে যারা প্রিয়।

নূর কুত্‌বুল আলমের উস্তাদ ছিলেন কাযী হামীদ উদ্দীন নাগরী। তাঁর হাতেই শিক্ষার হাতেখড়ি। তবুও আব্বা শায়খ আলাউল হকই ছিলেন তাঁর আসল উস্তাদ। শিক্ষার প্রতিটি সায়রেই ছেলেকে সাঁতরিয়েছিলেন। যেনো কোথাও আটকে না যান। ডুবে না যান। ধর্মের কথা। দেশ ও দশের কথা। পরিবার সংসারের কথা। শিক্ষার হিসাব

www.pathagar.com

থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়ে নি। বাদ পড়তে দেন নি। তাই ফুলের পাপড়ি অন্যায়ের রাজ্যে চক্‌চকে তলোয়ার হয়ে দেখা দিতো। কারণ একজন মুসলমানের কাছে দেশ আর তার ধর্মের কোনো তফাত নেই। দুনিয়ার সবকিছুই তো চলবে আল্লাহ্‌র কথামতো। তাঁর নির্দেশে। সেখানে দেশ কি আর দশ কি ! নূর কুত্‌বুল আলমও এ বিশ্বাসটাই মনের মধ্যে সাজিয়ে রাখতেন যতন করে।

তাই গণেশের বাড়াবাড়ি তাঁর ভালো লাগে নি। ভালা লাগে নি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজকাম। রাজা গণেশকে তিনি সাবধান করেছিলেন। তবু গণেশের মেজাজে তেমন কোনো হেরফের হলো না। বরং আরো গরম হলো।

নূর কুত্‌বুল আলম বুঝলেন, চিড়া ভেজাতে হলে পানি দরকার। তিনি পানির ব্যবস্থা করলেন। এদেশের মুসলমানদের দুর্গতির কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন, জৌনপুরের সুলতান ইব্‌রাহীম শর্‌কীর কাছে চিঠিতে অনুরোধ করলেন, 'গণেশের এ বাড়াবাড়ির জবাব প্রয়োজন। সুলতান যেনো এর একটা বিহিত করেন। আর তা না হলে এদেশের মুসলমানদের দুর্দিন আরো ঘন হবে।'

নূর কুত্‌বুল আলমের নামের এবং জ্ঞানের যে ঝলমলে রঙ, জৌনপুরের দরবার কেবল নয় আশেপাশের অনেক দরবার পর্যন্তই পৌঁছে গিয়েছিলো ইতোমধ্যে। তাই সুলতান তাঁর ওজন জানতেন। রাজা গণেশের কাছেও এ খবর অজানা ছিলো না। কিন্তু সে ছিলো জাতিগত হিংসায় অন্ধ।

বাংলা মুল্লুকের ভাইদের বিপদ ! এ বিপদে সুলতান হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। এর মুকাবিলা করা তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্যও। তাছাড়া নূর কুত্‌বুল আলমের অনুরোধ কিছুতেই অবহেলার ব্যাপার নয়।

www.pathagar.com

সুলতান ইবরাহীম শরকীর হৃদয়ে দুঃখের নীল ঝালর কেঁপে উঠলো। কেঁপে উঠলো কটিতে ঝোলানো তলোয়ার। গতরে রক্তেরও কাঁপন। চেহারায় লালের হালকা প্রলেপ। বিশ্বাসের সবুজ দেয়ালে টোকা ! সত্যের সোনালী দুর্গে হামলা ? সুলতান ইব্‌রাহীম শর্‌কীর ঢাল-তলোয়ার শব্দ করে উঠলো। কেঁপে উঠলো ঘোড়ার কালচে খুর। চোখের তারায় আগুনের ফুলকি। যে আগুনের শিখা ছাই করে দেয় জুলুমবাজের রঙিন দালান-কোঠা।

জৌনপুরের সুলতান এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গেলেন দ্রুত, গণেশের রাজ্যসীমার কাছাকাছি। ফিরুজপুরে গিয়ে তাঁবু গাড়লেন। সুযোগ-সুবিধা মতো কামানের গোলায় আগুন দেবেন। রাজা গণেশের ঘাড় মটকাবেন। তার বাহাদুরির চকচকে পাথরগুলো টুকরো টুকরো করে আছড়ে ভাঙবেন। এ মতলবে।

বাতাসের শরীর ঘেঁষে ঘেঁষে খবর রাজা গণেশের কাছে পৌঁছে গেলো। বাঘ ঘরের দরজায়। যে কোনো সময় লাফ দেবে। ভয়ে তার চোখ ঘোলাটে হয়ে এলো। সুলতানের শক্তি-সামর্থ্যের কথা তার জানা আছে। মুকাবিলা করার অর্থ জেনে-শুনে মরণের গুহায় পা রাখার শামিল। মুসলমানদের উপর যে অন্যায়-অবিচার করেছে আর হয়তো রক্ষা নেই।

রাজা গণেশ সব সময়ই কুটিল বুদ্ধির লোক। অন্ধকারে হাঁটা-হাঁটি তার স্বভাব। এবারও একটা কুটিল চাল চাললো। নূর কুত্‌বুল আলমের সামনে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। দাগী আসামীর মতো। অপরাধের মাফ চাইলো। ওয়াদা করলো আর কোনো দিন তার চাবুক মুসলমানদের পায়ের কাছেও ঘেঁষবে না। এবারকার মতো তিনি যেনো সুলতানের গোস্‌সা থেকে রেহাই দেন। এ-কাজ কেবল তাঁর দ্বারাই সম্ভব। প্রয়োজন দু'একটি কথা। সুলতানকে একটু অনুরোধ।

www.pathagar.com

নূর কুত্‌বুল আলম জানালেন 'অসম্ভব'। কারণ একে তো সুলতান ইবরাহীম শর্‌কী তাঁরই অনুরোধে এসেছেন। তাছাড়া সবচে বড় কথা হলো একজন অত্যাচারী মূর্তিপূজকের জন্যে তিনি কোনো আবদার রাখতে পারবেন না সুলতানের কাছে। এ হবে অন্যায়।

রাজা গণেশ দেখলো তার চালবাজির সুতোগুলো এক এক করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর বিপদের ভয়াল রাত নামছে তার স্বপ্নের বাগানে। এ বাগান হয়তো এখনি ডুববে আঁধারে। সময় কম। কি করা ! সুলতান ইবরাহীম শর্‌কীর ঘোড়া তার বুকের উপর দিয়ে চলে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। নিরূপায় গণেশ তার বুদ্ধির থলে থেকে বের করে আনলো শেষ গুটি, তখন। নূর কুত্‌বুল আলমের সামনে মেলে ধরলো সে গুটির আলো-আঁধারি গতর। রাজা গনেশ- সত্যের নিশান হাতে তুলে নেবে। অর্থাৎ মূর্তিপূজা ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বউ-বাচ্চাসহ মুসলমান হয়ে যাবে। অতীতের সব অপরাধের জন্যে তওবা করবে। কিন্তু বাধ সাধলো তার বউ। নূর কুত্‌বুল আলমও জানতেন এটা গণেশের ভাঁওতা। সামনে বিপদ, এজন্যেই তার মুখে এ মধু বাক্য। সত্যের জন্যে দরদের নদীতে এতো ঢেউ।

বউয়ের কারণে রাজা গণেশ মূর্তি পূজকই রয়ে গেলো। কিন্তু গরজ বড় বালাই। বার বছরের ছেলে যদু। গণেশ তার এ ছেলেকেই নূর কুত্‌বুল আলমের হাতে সঁপে দিলো। ওয়াদা করলো যদুকে মুসলমান করা হলে তাঁকেই সিংহাসনে বসানো হবে। গণেশ শুয়ে-বসে কাল কাটাবে।

কি আর করা! রাজা গণেশের কান্নাকাটিতে নূর কুত্‌বুল আলম রাযি হলেন। তিনি এক টুকরা সুপারি চিবিয়ে যদুর মুখে দিলেন। তারপর বালক যদুর বুকে সত্যের কিছু সোনালী শব্দ গেঁথে দিলেন। তার নাম রাখলেন জালালউদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্। বাংলার সিংহাসনে বসলো বালক জালালউদ্দীন। এদিক-সেদিক নির্দেশ পাঠানো হলো তার নামে খুত্‌বা

www.pathagar.com

পাঠের। বাংলার আকাশে আবার সবুজ নিশান তার মাথা উঁচু করলো। জারি হলো আল্লাহ্‌র আইন। একটা স্বস্তির বাতাস বইলো আবার। নূর কুত্‌বুল আলমের অনুরোধে সুলতান ইব্‌রাহীম শর্‌কী জৌনপুর ফিরে গেলেন। তবে মনে মনে কিছুটা গোস্‌সা হলেন সুলতান।

মন্দ লোকদের সবটা শরীরই থাকে বদমতলবের আখড়া। কথা আর কাজে কোনোদিনও মিল থাকে না তাদের। শুরু থেকেই রাজা গণেশ ছিলো এ স্বভাবের মানুষ। সুযোগ পেলেই সে তার এ অভ্যাসটাকে রঙচঙ মেখে দিনের আলোতে নিয়ে আসতো। এখনো তাই করলো। সুযোগের অপেক্ষায় কেবল সময়ের পাতা ছিঁড়ছিলো সে। সুলতান জৌনপুরে ফিরে গেছেন সসৈন্যে। বিপদের কালোরাত এখন ধবধবে সাদা।

জালালউদ্দীনকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলো হেঁচ্‌কা টানে গণেশ। সিংহাসনে আবার নিজেই বসলো। তার ওয়াদার বাক্যগুলো ঘষে-মেজে সাফ করে নিলো।

জালালউদ্দীন ছেলে মানুষ। তার কিছুই করার ছিলো না। করার কোন শক্তিও ছিলো না।

আসলে ক্ষমতা তো গণেশের হাতেই। ছেলেকে মুসলমান করা, তারপর তাকে রাজা বানিয়ে মুসলমানদের গোঁলক-ধাঁধায় ফেলা- এর সবটাই ছিলো লোকদেখানো। ভাঁওতা। চাবুক এবার আরো শক্ত হলো। মোটকথা রাজা গনেশ তার চেহারাই পালটে ফেললো মুসলমানদের ব্যাপার।

এবার চাবুক অনেক বড়ো হলো। চাবুকের লকলকে জিহ্বা নূর কুত্‌বুল আলমের ঘরের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। দুষ্ট লোকেরা তো এমনি হয়। উপকারীর বদলা দেয় অপকার করে। অনিষ্ট করে। গণেশও সেই পচা গলিতেই হাঁটলো। এখন নূর কুত্‌বুল আলমকেই পহেলা নম্বরের দুশমন ধরে নিলো রাজা গণেশ। চলাফেরা ভাবভঙ্গিও

www.pathagar.com

তার তেমনি হলো। নূর কুত্‌বুল আলমের বাড়ির লোকজন, তাঁর সঙ্গী-সাথী কাউকেই রেহাই দিলো না। সবার পিঠই লাল করে দিলো। নূর কুত্‌বুল আলমকে ধাক্কা দেয়া ঠিক হবে না, হয়তো সামাল দেয়া মুশকিল হতে পারে; তাই আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করলো রাজা গণেশ।

শায়খ আনোয়ার আর শায়খ জাহিদ রাজা গণেশের কুনজরে পড়লেন। অপরাধ, তাঁরা সত্য কথা বলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের বাতাসে এতো জোর যে, রাজার সিংহাসনই উলটে যায় এমন অবস্থা। তাই তাঁদের দু'জনকেই সে দেশছাড়া করলো। নির্বাসন দিলো ঢাকার সোনার গাঁয়। শায়খ আনোয়ার ছিলেন নূর কুত্‌বুল আলমের ছেলে। আর শায়খ জাহিদ নাতি। এ-ও বুঝি তাঁদের আরো একটা অপরাধ। গণেশ রাজার নজরে।

এরপরও রাজা গণেশের মনে শান্তি নেই। কি জানি কখন কি হয় ! ভয়েরা হাঁটাহাঁটি করে তার কাছ ঘেঁষে। কারণ নূর কুত্‌বুল আলম বাংলার মুসলমান অর্থাৎ অসহায় মানুষজনদের মাথা। সিংহের মতোই যার চাল-চলন। শক্ত-সাহস। গণেশ সে সিংহের লেজেই তো হাত রেখেছে।

ভয় অনেক সময়ই বুদ্ধি শুদ্ধি গিলে ফেলে। গিলে ফেলে লাজ-শরমও। তাই হলো। গণেশ শায়খ আনোয়ারকে হত্যা করলো। আর এ হত্যাকাণ্ড-এ মরণই ডেকে আনলো গণেশেরও মরণ।

কোন সময়ই বাড়াবাড়ি ভালো নয়। এ পথে হাঁটাহাঁটি করতে গেলেই হাত ভাঙে। পা ভাঙে। অনেক সময় জান নিয়েই হয় টানাটানি। রাজা গণেশও এ পথে হাঁটতে গিয়ে বিপদে পড়লো। ভয়াল তুফানের মতো এল দুর্গতি।

এসব কিছুর আগে, ছেলেকে আবার পুরানো ধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলো সে। নানা আচার অনুষ্ঠান করে।

www.pathagar.com

এ জন্যে রাজা গণেশ তৈরি করলো একটি সোনার গরু। ব্রাহ্মণ-পুরুতেরা মিলে বালক জালালউদ্দীনকে সে সোনার গরুর মুখ দিয়ে ঠেলেঠুলে সেঁদিয়ে তারপর তাকে টেনেটুনে গরুর মল-দরজা দিয়ে বের করে আনলো। মন্ত্রতন্ত্র পড়ে জালালউদ্দীনকে আবার যদু বানালো। এরপর সোনার গরু ভেঙেভুঙে ব্রাহ্মণ-পুরুতেরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে গেলো, নিজেদের মধ্যে। তারা এ অনুষ্ঠানের নাম দিলো 'সুবর্ণ ধেনু ব্রত।'

ব্রাহ্মণ-পুরুতদের ধারণা, যদু মুসলমান হয়ে গোনাহ করেছে। এখন সোনার গরুর ছোঁয়ায় তার সব গোনাহ উড়ে গেছে। ধুয়ে-মুছে গেছে। কিন্তু এতো মন্ত্র-ফন্ত্র কোনো কাজে এলো না। মনের ভেতর সত্যের যে চারাগাছটি বড় হচ্ছিলো তার সতেজ শরীর তেমনি থাকলো। কারণ নূর কুত্‌বুল আলম ছিলেন আল্লাহ্‌র একজন খুব প্রিয় মানুষ। আর এ মানুষটিই যদুর মনের নরম জমিনে সত্যের সে চারাগাছটি লাগিয়েছিলেন। নিজ হাতে। তাই বালক যদুর বুকের মাঝখানটায় লুকিয়ে থাকলো জালালউদ্দীন। যে কোনো সময় উঁকি দেবে। কেবল সময়ের অপেক্ষায়।

সময় এসে গেলো। মারা গেলো রাজা গণেশ। একটা কালো মেঘ হঠাৎ করেই যেনো কোথায় মিলিয়ে গেলো। আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ঝরঝরে নীল উদার আকাশ।

তখন সময় চৌদ্দশ' আঠারো সাল।

রাজা গণেশের মরণ নিয়ে একটা গল্প আছে। গল্পটি হলোঃ যে-দিন যে-ক্ষণে শায়খ আনোয়ারের পবিত্র রক্ত টুপ্ করে পড়লো সোনার গাঁয়ের ঘাসে ঢাকা মাটিতে, ঠিক সেই মুহূর্তেই নাকি গণেশের জানও উড়াল দিয়েছিলো। কালো সেঁতসেঁতে হৃদয় থেকে।

বাবার মৃত্যু হলো। যদু আবার সিংহাসনে বসলো। তবে জালালউদ্দীন মাহমুদ শাহ নামে। বাংলার পলিপড়া মাটিতে আবার সত্যের সবুজ নিশান তার জয়ের কথা ঘোষণা করলো। শান্তির কথা ঘোষণা করলো। অবশ্য নূর কুত্‌বুল আলমই এর সব ব্যবস্থা করে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। বালক জালালউদ্দীনকে বুঝ-পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাহস দিয়েছিলেন। শক্তি দিয়েছিলেন। কারণ তিনিই ছিলেন রাজা গণেশের জুলুমে অতিষ্ট মুসলমানের আশা। ভরসা।

চম্পাফুলের পাপড়ির মতোই তিনি তাঁর ইচ্ছার কপাটগুলো খুলে দিয়েছিলেন। ভীষণ রোদের আস্তরণ ছিঁড়েছুঁড়ে। সব রকমের ভয়-ভীতি পায়ের আঙুলের টোকায় নর্দমায় ফেলে দিয়েছিলেন।

আব্বা আলাউল হকের মতো তাঁরও ছিলো মাদ্রাসা-খানকা-মুসাফিরখানা। সূর্যের রশ্মির মতোই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম এ-দিক সে-দিক ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাই দূরদূরান্ত থেকে আসতো ছাত্র। জানার আশায়। শেখার আশায়। নূর কুত্‌বুল আলমও জ্ঞানের রূপালী ইটগুলো ছাত্রদের মনের দেয়ালে ঠুকে ঠুকে বসাতেন। শিখাতেন মানুষের যারা দুশমন তাদের মুখের উপর হক কথা বলার কায়দা-কানুন। প্রতিরোধের কায়দা-কানুন। সাহস দিতেন। পথ চলার সাহস। আল্লাহ্‌র দেয়া সাহস। যে সাহসের ঢেউ সব অনাচারের ঘর-বাড়ি ভেঙেচুরে দেয়। দুমড়ে মুচড়ে ফেলে।

নূর কুত্‌বুল আলম যখন ইন্‌তেকাল করেন, তখন সময় চৌদ্দশ সাতচল্লিশ সাল। পাণ্ডুয়ার ছোট দরগায় তাঁর কবর। সেখানে শায়খ আহমদ আলাউল হকও শুয়ে আছেন পাশাপাশি। বাপ-বেটায় গলাগলি করে।

আল্লাহ্‌র কথামতো যারা চলাফেরা করেন, তাঁদের মনের ভেতর থাকে লাল সিংহ। যে সিংহের হুঙ্কারে সব ভয়েরা পালিয়ে বাঁচে। পালিয়ে বাঁচে গণেশের মতো রাজ-রাজড়াও।

তবে একটা কথা। যাদের বুকের মাঝখানটায় এ সিংহ আলতামাখা চোখ নিয়ে বসে থাকে, তারা সবাই কিন্তু আল্লাহ্‌র এক-একজন প্রিয় মানুষ। শাহ্ আহমদ নূর কুত্‌বুল আলমও ছিলেন তেমনি একজন।

এমন একজন কি আমরাও হতে পারি না ?

www.pathagar.com

জমজমাট বর্ষা। চারদিকে ঘোলা পানির দাপাদাপি। ঢেউয়ে ঢেউয়ে আসছে কচুরিপানা, বালিহাঁস আর পানকৌড়ির ঝাঁক। কখনো বাতাস আবার কখনো বিষ্টির দারিবান্ধা খেলা। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দেয় লাল রঙ মাখা বোকা সুরুজ। নদীর তীরগুলো ডুবে গেছে। কোথাও কোথাও দু' একটা কাশফুলের সাদা চুল

ঈমানের জোর

ফুরফুর করে উড়ছে। ব্রহ্মপুত্র নদীতে ফুলে ফুলে উঠেছে পানি। তীর প্রায় ছুঁই ছুঁই। যে কোনো সময় পানি উঠে যাবে তীরে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সৈন্যশিবির। তারা এখানে দীর্ঘ সাত মাস যাবৎ বসে আছে। সৈন্যদের চেহারায় হতাশার ছাপ। মন কেমন ভেজা ভেজা। সাহসের ঝালরগুলো

www.pathagar.com

কুট কুট করে কাটছে ঘুণপোকা। তাছাড়া আছে কড়া মেজাজের সেনাপতি। আর কত সময় এ-ভাবে? সৈন্যদের মনে প্রশ্ন।

এবার খোলামেলা কথায় আসা যাক।

বাদশাহ আকবর তখন সিংহাসনে। হুমায়ুনের ছেলে আকবর ছিলেন মোগলদের তিন নম্বর সম্রাট। আকবর যখন সিংহাসনে বসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো। তাঁর সময়কার কথা। কাহিনী। ইতিহাস থেকে কুড়িয়ে আনা কাহিনী।

রাজ্যে এদিক-সেদিক বিদ্রোহ। একদিক সামলাতে সামলাতে আবার অন্যদিকে গোলমাল। দারুণ বিশৃঙ্খল অবস্থা। কি আর করা যায়! রাজা-বাদশাহদের মাঝে-মাঝে এমন ধকল সইতে হয়। তা না হলে আবার রাজা কিসের !

ভাটি মুল্লুকে বিদ্রোহ করেছেন ঈসা খাঁ। বারভুঁইয়াশ্রেষ্ঠ ঈসা খাঁ। মোগলদের চোখরাঙানি তিনি মানতে রাজি নন। তিনি চান নিজের মতো করে চলতে। আপন রাজ্য আপনার মতো করে গড়ে তুলতে। কারও কথার তিনি ধার ধারেন না। ঈসা খাঁর মনে তখন সোনারঙ স্বপ্ন। তাঁর স্বপ্নের আকাশে উড়ছে লাল-নীল-হলুদ বেলুন। শোঁ শোঁ করে বইছে মুক্তির ধোঁয়াটে বাতাস।

শুরুতে ঈসা খাঁ ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল পরগণার জমিদার। পরে তিনি খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ছোট ছোট জমিদাররা তাঁকে সরদার বলে মেনে নেয়। তাঁর রাজ্যসীমা ফুলে ফেঁপে অনেক মোটা হয়ে ওঠে।

ঈসা খাঁর পিতা ছিলেন মুলতানার রাজপুত। নাম কালীদাস গজদানী। অনেকের মতে আফগান। যাক সে কথা। তিনি বাংলাদেশে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। তখনকার বাংলাদেশে সত্যের সুবাতাস হু হু করে বইছিলো। আকাশে-বাতাসে শান্তির সুগন্ধি। কালীদাস সত্যের সুগন্ধি মেখে নিলেন তাঁর ভেতরে। তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। পরে তাঁর নাম হয়েছিলে সুলায়মান খাঁ।

www.pathagar.com

ঈসা খাঁর রাজধানী ছিলো সোনার গাঁয়। তাঁর প্রাসাদ ছিল কাতরাবো। আর এগারসিন্ধুতে তাঁর একটি দুর্গ। সবগুলো জায়গাই ঢাকার নারায়গঞ্জের আশেপাশে।

হ্যাঁ। ভাটি অঞ্চলে ঈসা খাঁ আর উজানে মাসুম কাবুলী বিদ্রোহের লাল নিশান উড়িয়েছেন। কি করা যায় ! আকবর চিন্তার সাগরে ডুব দিলেন। বাংলার সুবাদার তখন শাহ্বাজ খাঁ। শাহ্বাজ খাঁকে হুকুম দেয়া হলো বিদ্রোহ দমনে। তিনি মাসুম কাবুলীর রাজ্য আক্রমণ করলেন। পরাজিত হলেন মাসুম কাবুলী। তিনি পালিয়ে এলেন ভাটি মুল্লুকে। ঈসা খাঁর রাজ্যে। ঈসা খাঁ তাঁকে আশ্রয় দিলেন। কেননা, রতনে রতন চেনে। শাহ্বাজ খাঁ-ও কম না। মাসুম কবুলীকে যে করে হোক তাঁর চাই-ই। তিনি তাঁর পিছু নিলেন। ঢুকে গেলেন ঈসা খাঁর রাজ্যসীমায়। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পারে তাঁর শিবির। শাহ্বাজ খাঁ ঈসা খাঁর কাছে মাসুম কাবুলীকে চাইলেন। ঈসা খাঁ কিন্তু খুব চালাক। তিনি কূটনীতির খেলা খেললেন। দেই-দিচ্ছি বলে কাটিয়ে দিলেন সাত মাস। মোগল সেনাবাহিনীতে কিছুটা অসন্তোষের আগুন আস্তে আস্তে জ্বলছে। আর অন্যদিকে ঈসা খাঁ হচ্ছেন শক্ত। যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে গোপনে। সুযোগ বুঝে আক্রমণ চালাবেন তিনি। সুযোগ এসে গেলো। তা-ধিন তা-ধিন করে নাচ জুড়ে দিলো বর্ষা। চারদিকে থৈ থৈ পানি। চকচক করে উঠলো ঈসা খাঁর চোখ দু'টো। তিনি ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ কেটে দিলেন। মোগল শিবিরে ঢুকলো পানি। পানির তোড়ে শিবির ভেসে গেলো। অনেক সৈন্য মারা পড়লো। অনেকে পালিয়ে গেলো এদিক-সেদিক। শাহ্বাজ খাঁ চোখে সরষে ফুল দেখলেন।

শাহ্বাজ খাঁ ভাওয়ালের এক উঁচু জায়গায় আবার শিবির গাড়লেন। মনে তাঁর এলোমেলো বাতাস-এখন কি করা যায়। ঈসা খাঁ কিন্তু বসে নেই। তিনি ভাওয়ালে শাহ্বাজ খাঁকে আক্রমণ করে বসলেন। শাহ্বাজ খাঁ পরাজিত হলেন। ফিরে গেলেন টাণ্ডায়। টাণ্ডা ছিলো পশ্চিম বাংলার মালদহ জেলায়। সেখানে মোগলদের একটা দুর্গ ছিলো। সময়টা ১৫৮৪ সাল।

www.pathagar.com

বেশি কিছুদিন কেটে গেলো এরপর। আকবরের হুকুম- 'আবার বাংলা আক্রমণ কর'। শাহ্‌বাজ খাঁর মনের বাঘটা জেগে উঠলো। গর্জন করে উঠলো। তিনি বাংলার দিকে মুখ করলেন। সময় তখন ১৫৮৬ সাল। এবারে কিন্তু ঘটনা ঘটলো অন্যরকম। তিনি এগারসিন্ধু দখল করলেন। কাতরাবো লুট করলেন। ঈসা খাঁর রাজধানী সোনারগাঁয় প্রবেশ করলেন। শাহ্‌বাজ খাঁর চোখে তখন সূর্য ঝলমল করছে।

ঈসা খাঁ কিন্তু ভীষণ চালাক। তিনি আবার কূটনীতির খেলা খেললেন। বেগতিক দেখে সন্ধি করলেন। মোগলদের সব জায়গা ফিরিয়ে দিলেন। বন্দী এবং গোলাবারুদও ফিরিয়ে দিলেন, যা তিনি গত যুদ্ধে হাত করেছিলেন।

মোগল সুবাদার শাহ্‌বাজ খাঁ। ১৫৮৩ সালে বাংলার সুবাদার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুব কড়া মেজাজের লোক। তাহলে কি হবে, ধর্মের ব্যাপারে ছিলেন দারুণ কঠোর। তাঁর ঈমানের ছিলো প্রচণ্ড জোর। ইসলামকে শক্ত করে হৃদয়ে বেঁধে রাখতেন। নামায কোনোদিন তিনি কাযা করেন নি, তা যে কোনো অবস্থায়ই হোক না কেনো। তিনি আকবরের জগাখিচুড়ি ধর্ম দীন-ই-ইলাহীর ছিলেন তুখোড় সমালোচক। আকবরের মুখের ওপর তিনি অনেক সত্য কথা বলে দিতেন। তাঁর মনে থাকতো সবসময় আল্লাহ্‌র ভয়। সেখানে চকচক করতো সত্যের ধারালো তরবারি।

শেষমেশ শাহ্‌বাজ খাঁ বিহারে সুবাদার নিযুক্ত হয়ে-ছিলেন। ১৫৯৯ সালের ১১ই নভেম্বর তিনি আজমীরে ইন্তেকাল করেন। আবুল ফযলের 'আকবর-নামা' থেকে আমরা এ-কথা জানতে পারি।

সুবাদার শাহ্‌বাজ খাঁর জীবনের একটি ঘটনা। একদিন আকবর বাদশাহ এবং শাহ্‌বাজ খাঁ পাশাপাশি হাঁটছিলেন। একটি দীঘির কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। সাদা সাদা হাঁসগুলো ঢেউ-এ ঢেউ-এ ভাসছে। তখন আসরের সময় হয় হয়। সূর্য হেলে পড়েছে। দীঘির পানিতে লাল বলের মতো সূর্যটা থির থির করে কাঁপছে। একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন আরো কিছু উমরা। তাঁরা বলাবলি করছিলেনঃ 'আজকে দেখবো

www.pathagar.com

শাহ্‌বাজ খাঁর সাহস। কি করে তিনি নামায পড়েন !' শাহ্‌বাজ খাঁর কিন্তু নামাযের ব্যাপারে ভুল হতে পারে না। তিনি সূর্যের দিকে তাকালেন। তাই তো ! নামাযের সময় হয়ে গেছে। তিনি বাদশাহ্ আকবরকে বললেনঃ 'নামাযের সময় হয়ে গেছে। চলুন।' আকবর বললেনঃ 'এখন নামায থাক না ! পরে কাযা পড়ে ফেলবেন।' শাহ্‌বাজ খাঁর হৃদয়ে শান্তির পাখিটা তখন নাচানাচি করছে। শাহ্‌বাজ খাঁ আর কোনো কথা বললেন না। কেবল পা দুটোকে থামিয়ে দিলেন। তারপর কাছেই দাঁড়িয়ে গেলেন নামাযে। শাহ্‌বাজ খাঁর ঈমানের জোর দেখে তো উমরারা অবাক।

আঁধার কেটে কেটে আলোর রশ্মি আকবরের হৃদয়ে ঢুকলো কিনা বোঝা গেলো না। উমরাদের মনের চিরল চিরল পাতাগুলো তখন দুলছে। আকবরের চেহারায় শরমের কালো পর্দা।

আল্লাহ্‌র ভয় সব ভয়কে মুছে দেয়। আমরা তাহলে সুবাদার শাহ্‌বাজ খাঁর হৃদয়ে আমাদের হৃদয় ঘষে নেই, সেখানে জ্বলুক সাহসের অনির্বাণ চেরাগ।

www.pathagar.com

সুরুজটা তখন মাথার তালুর ওপর ঝুলছে।

কোথাও কোনো পাখি নেই। ফুল নেই। বাঁশপাতার ঝির ঝির ছন্দের কথা নেই। নদীর ঢেউয়ের মতো কলকল হাসি নেই। রাখালের মধুঝরা বাঁশি নেই। নেই হৃদয় থেকে উপচে পড়া সুবাস। কেবল ধোঁয়াটে আকাশ। আর যোজনব্যাপী এক ভয়ঙ্কর ময়দান। ময়দানের

সারা গতর জুড়ে মানুষ ঘোড়া হাতী আরো কতো কি !

বিশ্বাসের লাল শিখা

সে ময়দানে চলছে দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ। তলোয়ারের কোপে শরীর থেকে আলাদা হচ্ছে কারো মাথা। কারো পা। কারো হাত। কারো পাঁজর ভেদ করে চলে যাচ্ছে তীরের বিষাক্ত ফলা। হাতীর পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হচ্ছে কেউ

www.pathagar.com

ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ আওয়াজ। আর লাল রক্তের নদী। একেকটা মানুষের মনের খোঁয়াড়ে তখন ঘর বেঁধেছে একেকটা বাঘ। চোখের তারাগুলো যেনো ইটখোলার চুল্লির মতো ধপ্ ধপ্ জ্বলছে।

যুদ্ধের তখন ভয়ানক চেহারা। যেনো-'কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান'। একপক্ষে আছে বোখারার বাদশাহ আবদুল আজিজ খাঁর বিশাল বাহিনী। সে বাহিনীর সেনাপতি বাদশাহ নিজেই। অপরপক্ষে মোগল যুবরাজ আলমগীর। শক্তি সাহস অফুরন্ত। যুদ্ধের পর যুদ্ধে জিতেছেন তিনি। দৈর্ঘে-প্রস্থে বড় হচ্ছে পিতা শাহ্জাহানের রাজ্যের সীমানা। আশেপাশের রাজারা মনের ভেতর ভয় পুষে রাখেন। সে ভয় নারকেল পাতার মতো থির থির করে কাঁপে। আবার কেউ কেউ নিজেদের বুক ঘষে নেন মোগল বাদশাহ্র বুকের সাথে। তখন ভয়ের কাঁপন থেমে যায়।

যুদ্ধ চলছে। ভীষণ যুদ্ধ। সহসা থেমে যাবে এমন কোনো আলামত নেই। জয়, আর তা নাহলে ক্ষয়। দেখে শুনে মনে হয়, এটা যেনো দু'পক্ষেরই মনের কথা। হাতীর পিঠে বসে মোগল সেনাপতি যুবরাজ আলমগীর। নিজের সেনাদের অবস্থান দেখছেন। সাহস দেখছেন। বীরত্ব দেখছেন। আর নতুন আক্রমণের কায়দা-কৌশল নিয়ে ভাবছেন। যুদ্ধ ব্যাপারটাই তো এরকম। যে যত চালাক, যে যতো কৌশলী, সে-ই শেষমেশ জয়ী হয়।

নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করে শত্রুকে আক্রমণ করতে হয়। হোক না শত্রুপক্ষে সৈন্য বেশি। শক্তির সাথে বুদ্ধি না থাকলে নির্ঘাত পরাজয়। যুবরাজ বুদ্ধির সাথে বোঝাপড়া করছিলেন। সুরুজটা তখন মাথার তালুর ওপর গাঁদা ফুলের মতো ঝুলছে। সেনাপতির চোখ সেখানে গিয়ে আটকে গেলো। মুহূর্তে তাঁর মনের সব ভাবনারা উড়াল দিলো। ধীরে ধীরে ভুলতে লাগলেন সব। যুদ্ধ-রাজা-রাজ্য-হাতী-ঘোড়া সব। এমন কি জীবনের কথাও।

বিরাট এক সিংহদরজা খুলে যাচ্ছে। অন্য এক রাজ্যে প্রবেশ করলেন তিনি। সে রাজ্যে কেবল ঝলমলে দুপুর। আর প্রজাপতির

www.pathagar.com

পাখার মতো হাসি। সে রাজ্যের রাজা সবার রাজা। পৃথিবী- চাঁদ-সুরুজ-তারা- আকাশ-বাতাস- নদী-সাগর- মানুষ-পশু-পক্ষী সব তাঁর রাজ্যের বাসিন্দা। তাঁর রাজ্যে কোনো অনিয়ম নেই। বিশৃঙ্খলা নেই। মারামারি নেই। কাটাকাটি নেই। হিংসা নেই। সে বিশাল রাজ্যের শাসক তিনি একা। তাঁর শক্তির কোনো কুল নেই। কিনার নেই। সেই মহাশক্তিধর রাজার দরবারেই প্রবেশ করলেন যুবরাজ। সে রাজার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালেন। মাফ চাইলেন। ভয়ে তাঁর শিরদাঁড়া কাঁপছে।

যুদ্ধের চেহারা তখন লাল থেকে আরো লাল হচ্ছে। বোখারার বাদশাহ দূর থেকে মোগল সেনাপতির গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে যেনো কেমন কেমন ঠেকছিলো। একটা ঠাণ্ডা স্রোত তাঁর ঘাড় বেয়ে নিচে নামছে। তিনি যেনো কোনো স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর মনের বারান্দায় তখন ভয় আর শ্রদ্ধ মেশানো সুবাসিত বাতাসের খেলা।

কথাটা আরো সহজ করে বলছি- সারা ময়দান জুড়ে যুদ্ধ চলছে। তখন সময়টা ছিলো যোহরের। যুবরাজ বারকয়েক আকাশের দিকে দেখলেন। তারপর হাতীর পিঠেই তিনি নামাযের জন্য প্রস্তুত হলেন। এবং নামায পড়া শুরু করলেন। সাঁই সাঁই করে তীরগুলো এদিক-সেদিক দৌড়ে চলে যাচ্ছে। যুবরাজ একমনে নামায পড়ছেন। তিনি নামায কাযা করতে নারাজ। তাছাড়া বলা তো যায় না যুদ্ধের ব্যাপার। কখন কি হয়। কাযা পড়ার সময়ও যদি আর না পাওয়া যায়!

এ দৃশ্য বোখারার বাদশাহ আবদুল আজিজ খাঁর মনের গতি উলটে দিলো। কতো বড়ো বড়ো রাজা-বাদশাহ তাঁর বন্ধু। কতো যুদ্ধ তিনি করেছেন। কতো দেশ তিনি জয় করেছেন। কই, এমন দৃশ্য তো তাঁর চোখে কোনোদিন পড়ে নি! সাদা নিশান উড়িয়ে দিলেন তিনি। যুদ্ধ থেমে গেলো। আলোকিত হলো শান্তির সোনালী সড়ক। এই সোনালী সড়কে হাঁটলেন দুই সেনাপতি।

আলমগীর বরাবরই ছিলেন এ-রকম। আল্লাহ্‌র প্রতি ছিলো তাঁর অগাধ বিশ্বাস। আশা। ভরসা। আর দরদের থই থই নদী। বোখারার

www.pathagar.com

বাদশাহ বলেছিলেন, 'আলমগীর সাধারণ মানুষ নন- জিন্দাপীর'। ইতিহাসেও লেখা আছেঃ জিন্দাপীর আলমগীর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি হৃদয়ের ঝলমলে ঘরটাতে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন বিশ্বাসের সোনালী চেরাগ। নিভতে দেন নি কখনো।

এখন তাহলে জিন্দাপীরের পরিচয়টা ভাল করে জেনে নেযা যাক। জেনে নেয়া যাক তাঁর জীবনের আরো কিছু সোনালী-রূপালী কথা।

মুহিউদ্দীন আলমীগর আওরঙযেব ছিলো এ জিন্দাপীরের পুরো নাম। আর মোগল সম্রাট শাহজাহান ছিলেন তাঁর আব্বা। আম্মা সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল। জন্মেছিলেন বোম্বের দোহাদ শহরে। সময় ষোল শ' আঠারো খৃস্টাব্দের চব্বিশে অক্টোবর। ইতিহাসে আলমগীর কিন্তু সম্রাট আওরঙযেব নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর ছিলো আরো তিন ভাই এবং দুই বোন। ভাইদের নাম ছিল দারা,শুজা এবং মুরাদ। আর বোন রওশনআরা, জাহানআরা। আওরঙযেব ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। ছোট সময় থেকেই তিনি ছিলেন আলাদা রকমের। চলনে-বলনে। স্বভাবে-চরিত্রে। কি যেনো একটা ভাবনা ছিলো তাঁর। কালো দুটি চোখের তারায় সে ভাবনা লেপ্টে থাকতো সারাক্ষণ। হৈ চৈ তাঁর ভাল লাগতো না। বেশিরভাগ সময়গুলো কাটতো একা একা। রাজদরবারের এতোসব জৌলুস রঙ ঢঙ এ-ও ছিলো তাঁর অপছন্দ। আওরঙযেব মনে করতেন এগুলো বেহুদা খরচ। অপব্যয়। অপব্যয় তো আল্লাহ্ অপছন্দ করেন। তিনি তাঁর উস্তাদের কাছে শিখেছেন এসব ভালো কথাগুলো। উস্তাদের কাছে তিনি আরো অনেক কিছু শিখেছেন। জেনেছেন। ধর্মের কথা জেনেছেন। অধর্মের কথাও জেনেছেন। জেনেছেন আরো অনেক অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা।

আওরঙযেব ছিলেন কুরআনে হাফিয। হৃদয়ের নরোম দেয়ালে গেঁথে রাখতেন তিনি কুরআনের প্রতিটি হরফ। আরবী-ফারসী ভাষায় তাঁর ছিলো অনেক জ্ঞান। জ্ঞানের বিশাল জমিনে তিনি পাকা জহুরীর মতো হাঁটাচলা করতেন। যেখানে যা পেতেন, বুকের জেবে তিনি তা তুলে রাখতেন। তারপর তা আবার মানুষের মাঝেই বিলিয়ে দিতেন।

www.pathagar.com

মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতেন। আওরঙযেবের আব্বা শাহজাহান ছিলেন মোগলদের পঞ্চম সম্রাট। সুন্দরের সাথে ছিলো তাঁর ভীষণ ভাব। রাজ্যকে, রাজ-দরবারকে তিনি সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন সুন্দর সুপুরুষ। তাজমহল তাঁর অমর সৃষ্টি। দুনিয়ার যতোগুলো অবাক করা জিনিস আছে- তাজমহল তাদের মাঝে একটি। বিশ হাজার মানুষ বাইশ বছর খেটে-খুটে তবে তৈরি করেছিলো এ তাজমহল। সারা পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা অনেক দামী-দামী পাথর এবং হীরা-জহরত তাজমহলের সারা শরীরে ছড়ানো-ছিটানো। ভারতের আগ্রা শহরে এই তাজমহল। যমুনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেনো ভাসছে। শাহজাহান ছিলেন কবি। ফারসীতে অনেক ভালো ভালো কবিতাও তিনি লিখেছিলেন। একজন ভালো কবি ছাড়া তাজমহলের মতো এমন একটা সুন্দর জিনিস আর কে গড়তে পারে !

আওরঙযেবের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন তুর্ক মানুষ। তুর্ক জায়গাটি এখন রাশিয়ার একটি প্রদেশ। জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবুর ছিলেন প্রথম মোগল যিনি ভারতে এসেছিলেন। মোগলদের পহেলা সম্রাট ছিলেন এই জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবুর।

তারো আগের কথা। আওরঙযেবের আদি পুরুষেরা ছিলো মঙ্গোলিয়ার আধিবাসী। তখন তারা ছিলো অবিশ্বাসী। তারা আগুনের পূজা করতো। মারামারি করতো। কাটাকাটি করতো। তবে-তাঁরাও রাজা। শক্তিধর রাজা। চেঙ্গিস খাঁ, হালাকু খাঁ সে বংশেরই নামকরা রাজা। যাদের নাম শুনলেই সেকালের বড় বড় রাজারা ভিরমি খেতো। কাঁপতো। বেশ কয়েকপুরুষ পর তাঁরা সত্যের পরশ পেয়েছিলেন। শান্তির পরশ পেয়েছিলেন। সভ্য হয়েছিলেন। মানুষ হয়েছিলেন। তখন হৃদয়ের জং ধরা দেয়ালটা ফুটো করে শান্তির শাখিটা তাঁদের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো। তাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন। আওরঙযেব ছিলেন তাঁদেরই বংশের সন্তান। তৈমুর লং ছিলেন সে বংশের আর-এক শক্তিশালী রাজা। গল্পের মতো যাঁর জীবনের কাহিনীগুলো। ঝলমলে। ফুরফুরে। মঙ্গোলিয়া জায়গাটা এখন একটা স্বাধীন দেশ। চীন আর

www.pathagar.com

রাশিয়ার মাঝখানটায় এই মঙ্গোলিয়া রাজ্যটি। মোগল শব্দটা এসেছে সেই মঙ্গোলিয়া থেকেই।

আওরঙযেব ছিলেন মোগল বংশের শেষ বড়ো রাজা। তারপর থেকে মোগলদের শক্তি-সাহস মান-সম্মান নিচের দিকে নামছিলো। তিনি যখন সিংহাসনে বসেন, তখন সময় ষোল শ' ঊনষাট। রাজ্য জুড়ে বিশৃঙ্খলা। এখানে-সেখানে বিদ্রোহের লাল আগুন। ধপ্ ধপ্ করে জ্বলছে। শক্ত হাতে তিনি এসব বিশৃঙ্খলার ভাঁজ খুলেছিলেন। সে আগুন নিভিয়েছিলেন। তারপর-সবরকম খারাপ কাজগুলোকে তাঁর রাজ্যসীমার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

আওরঙযেবের বাপ-দাদারা বেশ কিছু অন্যায় কাজ চালু করেছিলেন। সব রাজা-বাদশাহরাই তো এ-রকম। সব রাজাদের দরবারেই এ নিয়ম চালু ছিলো। তারা ভাবতো, এটা তাদের বাহাদুরি। এ নাহলে আবার রাজা কিসের! যাদের মনে আল্লাহ্‌র ভয় নেই, তাদের সবার মনের ভেতরটাই এ-রকম হয়। তারা নিজেদেরই সবচেয়ে বড় মনে করে। ভাবে, আর সবাই ছোট। আসলে কিন্তু ছোট-বড়ো বলে কিছু নেই।

এমনি একটি অন্যায় অনুষ্ঠান। নাম ঝরোকা দর্শন। রাজা তাঁর জরিদার পোশাক, মাথায় মণিমুক্তা বসানো মুকুট এবং কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে রাজপ্রাসাদের চুড়ার কোনো খোলামেলা জায়গায় এসে খাড়া হবেন। ঢোল-বাদ্য বাজবে। নহ্‌বত বাজবে। কুচকাওয়াজরত সৈন্য-সামন্তরা আসা-যাওয়া করবে সারি সারি। চারদিক মোহিত হবে আতর-গোলাপের গন্ধে। আর গরীব প্রজারা দূর থেকে দেখবে এ-সব দৃশ্য। রাজা আর প্রজার মাঝে সম্পর্কটা ছিলো এ-রকম। এই ঝরোকা দর্শনের জন্যে ঠিকঠাক করা থাকতো নির্দিষ্ট একটা দিন।

আওরঙযেব রাজা আর প্রজার মাঝখানের কালো পর্দাটা ছিঁড়ে ফেললেন হেঁচ্‌কা টানে। প্রজার কাতারে রাজাকে মিশিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

কারণ সব মানুষই তো এক। একজন আর একজনের ভাই। ভাইয়ের সাথে দেখা সাক্ষাতে এতোসব ঢং কেন?

আর একটা নিয়ম। রাজদরবারে ঢুকতে হলে দূর থেকেই মাথা নত করে আসতে হতো। তারপর রাজার কাছাকাছি এসে উপুড় হয়ে মাটিতে চুমো খেতে হতো। যেমনি করে আমরা নামাযের সেজদা করি। আওরঙযেব দেখলেন, এ-তো ভীষণ অন্যায়। দারুণ গোনাহর কাজ! মানুষ মানুষের কাছে মাথা নোয়াবে কেন? একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই তো মানুষ তার মাথা নত করতে পারে। আর কারো কাছেই নয়। হোক না সে শক্তিধর রাজা। প্রতাপশালী বাদশাহ। আওরঙযেব এ নিয়মটিও বাতিল ঘোষণা করলেন। তিনি চালু করলেন কুরআনের আইন। আল্লাহ্‌র আইন। যে আইন সব মানুষকে এক কাতারে এনে খাড়া করে। রাজা-প্রজা বলে যেখানে আর কোনো শব্দ থাকে না। ধনী-গরীবের মাঝখানের দেয়ালটা যে আইন ভেঙে দেয় কঠিন হাতে। তিনি সেই সুবাসিত ব্যবস্থাকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিলেন রাজ্যের প্রতিটি কিনারায়। এতে করে কেউ কেউ বেজার হলো। আবার কারো কারো চেহারায় ফুটলো ফুলের মতো হাসি। বহুদিন পর মানুষ আবার শান্তি সুখের দেখা পেয়েছিলো। স্বপ্নের সবুজ রাজ্যটা তারা আবার ফিরে পেয়েছিলো।

এমনি আরো অনেক কিছু করেছিলেন তিনি দেশের মানুষের সুখ-শান্তির জন্যে। রাজ্যের জন্যে। সবচেয়ে বড়ো কথা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে।

আওরঙযেব ছিলেন একজন ভালো কবি। একজন উঁচুদরের লেখক। দার্শনিক। চিন্তাবিদ। ফারসীতে অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখেছেন তিনি। কবি জেবুন্ নিসার নাম কে না জানে ! আওরঙযেবের আদরের মেয়ে এই জেবুন্ নিসা। তিনি কবিদের খুব ভালোবাসতেন। রাজদরবারে প্রায়ই কবিতার আসর জমতো। বড়ো বড়ো কবিরা আসতেন। এক জমজমাট জলসা আর কি ! তাঁরা সবাই কিছু সময়ের জন্যে কল্পনার হালকা পাখায় ভাসতেন। লাল নীল স্বপ্ন দেখতেন।

www.pathagar.com

আওরঙযেবও তখন তাঁর কবিতার ঝলমলে পাখনাগুলো মেলে ধরতেন। হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসতেন। হাসতেন। হাসাতেন। শব্দের আড়ালে তখন রাজা-রাজ্য।

কবি জহির ছিলেন রাজকবি। আওরঙযেবের প্রিয় কবি। সেকালের খুব বড়ো কবি। বলা যায় শব্দের খেলোয়াড়। আওরঙযেব তাঁকে বছরে একবার সম্মানিত করতেন। কবির জন্যে রাষ্ট্রীয় ধনাগার খুলে দেয়া হতো। কবি সেখানে গিয়ে তাঁর দু'হাতে যতোগুলো হীরে নেয়া যায় তা নিয়ে আসতেন। কবি জহিরের জন্যে এই সৌভাগ্যের দিনটি ছিলো একেকটি ঈদের দিন। খুশির দিন।

আওরঙযেবও লিপিবদ্ধ করেছেন এক বিরাট বই। নাম 'ফতওয়ায়ে আলমগীর'। তাঁর তত্ত্বাবধানে সঙ্কলিত এ বইয়ের পাতায় পাতায় তিনি তাঁর মনের ইচ্ছাকে বন্দী করে গেছেন।

এতো বড়ো রাজা। কতো নাম-ডাক তাঁর। কতো বড়ো তাঁর রাজ্যের সীমানা। কতো সৈন্য-সামন্ত উজির-নাজির তাঁর। কতো ধন-রত্ন টাকা-পয়সা তাঁর। তাতে কি, খুব সাদা-সিধা ছিলো তাঁর চাল-চলন। হাব-ভাব। মেজাজ-মর্জি। ফকীর-বাদশাহ্ বলার কারণ ছিলো এখানেই। তাঁর হাতের লেখা ছিলো খুব সুন্দর। অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে তিনি কুরআন নকল করতেন। টুপি সেলাই করতেন নিজ হাতে। এগুলো বেচে নিজের ব্যক্তিগত খরচ-পাতি চালাতেন।

তাঁর মৃত্যুর সময়কার একটা ঘটনা। জীবনের ঝলমলে দিনগুলোর ওপর তখন অন্ধকার আস্তে আস্তে নামছে। কালো হয়ে আসছে রঙ-চঙে পৃথিবী। রাজা-রাজ্য। ধন-রত্ন। দরবার। সিংহাসন। এমনি যখন সময়, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র মুহাম্মদ আযমকে ডাকলেন এবং বললেন,-

'দওলতাবাদের ফকীর-দরবেশদের মাযারের পাশে আমাকে কবর দিও। কোনো রকম জাঁকজমক অনুষ্ঠান থেকে দূরে থেকো।

www.pathagar.com

এই এক টুকরো কাপড় দিলাম। হযরত হাসানের মাযারের ওপর শামিয়ানা বানিয়ে দিও।

টুপি সেলাই করে মোট চারশ আট আনা রোজগার করেছি, তা আয়া বেগমের কাছে জমা আছে। আমার মৃত্যুর পর তোমরা তা আমার জন্যে আল্লাহ্‌র নামে খরচ করো।

নিজ হাতে কুরআন নকল করে আয় করেছি তিনশ পাঁচ টাকা। সে টাকাও বেগমের কাছে আছে। আমি যখন তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো, তার পরপরই সে টাকা গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিও। আর একটা কথা, আমি যে পোশাকে এখন শুয়ে আছি, ঠিক এ পোশাকেই আমাকে কবর দিও।'

তারপর তিনি চলে গেলেন দূরে। বহুদূরে। অন্য এক জগতে।

মোট আটচল্লিশ বছর তিনি তাঁর শক্তির নিশান উড়িয়ে রেখেছিলেন। ন্যায়ের নিশান উড়িয়ে রেখেছিলেন।

তিনি যেদিন ইন্তেকাল করেন, সেদিনটা ছিলো জুমআর দিন। সতের শ' সাত সালের বিশ-এ ফেব্রুয়ারী। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো তিরাশি বছর।

বাদশাহ আওরঙযেব তো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসের সোনালী চেরাগটা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। আমরাও কি আমাদের মনের ভেতর সে-রকম একটা চেরাগ জ্বালাতে পারি না?

যার শিখা সব সময় জ্বলবে। আলো দেবে।

www.pathagar.com

সময় সতের শ' ছাপান্ন সাল। আলীবর্দী খাঁ ইন্তেকাল করেছেন। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব তিনি। নবাব মারা গেলেন। কিন্তু সিংহাসন তো আর খালি রাখা যায় না! তাই মির্যা মুহাম্মদ আলী শূন্য সিংহাসনে বসলেন। মাত্র তেইশ বছরের যুবক নতুন নবাব। সুন্দর সুঠাম শরীর। শক্তি সাহসও তাঁর অনেক। যুদ্ধ-টুদ্ধও করেছেন

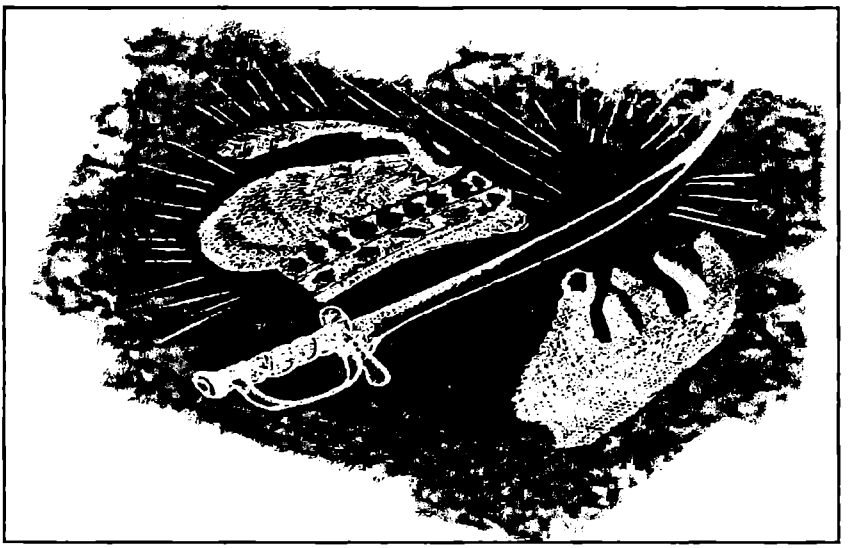

অনেক। বুদ্ধি-বিবেচনার কমতি নেই। নবাব হবার সব যোগ্যতাই আছে তাঁর।

ঢলের মতো গজব নামে

কিন্তু এই নতুন নবাবের পরিচয়টা কি, সে কথাই তাহলে এখন জানা যাক।

মির্যা মুহাম্মদ আলী-ইতিহাসে তাঁর পরিচয় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা নামে।

www.pathagar.com

আব্বার নাম জয়নুদ্দীন খাঁ। আর আম্মা আমিনা বেগম। তাদের আদি বাস ছিল তুর্কে।

আলীবর্দী খাঁরর আদরের নাতি এই সিরাজউদ্‌দৌলা। আলীবর্দী খাঁর কোনো ছেলে-সন্তান ছিলো না। ছিলো তিন মেয়ে। মেহেরুন নিসা, রাবেয়া বেগম আর সিরাজের আম্মা আমিনা বেগম। সিরাজ যখন নানার কোলে বসে হাসতো, খেলতো, কাঁদতো; তখন থেকেই আলীবর্দী খাঁ মনের ভিতর একটা গোপন ইচ্ছা লুকিয়ে রেখেছিলেন। আর সে ইচ্ছাটা ছিলো সিরাজকে সিংহাসনে বসাবেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বানাবেন। তাই তিনি সিরাজকে চোখে চোখে রাখতেন। কাছাকাছি রাখতেন। সাথে সাথে রাখতেন !

সিরাজউদ্‌দৌলা কখনো সুবাদার হলেন। আবার কখনো একজন দুর্ধর্ষ সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন। সিরাজ এভাবে শিখলেন আরো অনেক কিছু।

দিনগুলো হাঁটছে পিছনে আর সিরাজ হাঁটছে আগে। নবাব হবার সব যোগ্যতাই সিরাজ মনের সাথে, শরীরের সাথে,মেখে নিলেন। নানা আলীবর্দী খাঁর ইচ্ছাও ছিলো তাই। নানার সঙ্গী হয়ে সিরাজ বর্গীদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন বহু বহু দূর। তলোয়ারের আঘাতে কতো শত্রুর মাথা শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে দিয়েছেন। সিরাজ, সিরাজের ঘোড়া, সিরাজের তলোয়ার, এ-সব ছিলো শত্রুর আতঙ্ক।

ইংরেজ সিরাজের পহেলা দুশমন। একথা সিরাজ ভালো-ভাবেই জানতেন। নানা আলীবর্দী খাঁও নাতিকে বুঝিয়েছেন বারবার এসব কথা। কাছে ডেকে বলেছেন ঃ 'ইংরেজ এদেশের শত্রু। এদেশের মানুষের শত্রু। তোমার শত্রু। তারা মিথ্যুক। তারা ঠগ্‌। তারা মানবতার দুশমন। তাদের বিষদাঁত তুলে ফেলতে হবে। তা না হলে এদেশের শান্তি নেই। এদেশের মানুষের শান্তি নেই। তোমার শান্তি নেই।'

www.pathagar.com

সিরাজ নানার কথাগুলো খুব সাবধানে মূল্যবান ধন-রত্নের মতো মনের সিন্দুকে লুকিয়ে রাখলেন। আর ভাবলেন অনেক কথা।

ইংরেজরা খুব চালাক। তারা জানতো, সিরাজউদ্‌দৌলা নবাব থাকলে তাদের রক্ষা নেই। আশা-ভরসা, ব্যবসা-বাণিজ্য কোনোটাই আর হবে না। তারা দেখলো, সামনে একটা পর্দা ঝুলছে। এ পর্দা ছিঁড়তে হবে যে করেই হোক। গোপন সভা করে তারা এ সিদ্ধান্ত নিলো। এ ব্যাপারে তারা এ দেশীয় কিছু মুনাফিক নিমক-হারামকে হাত করলো। তারা কেউ আসলো টাকার লোভে। কেউ ক্ষমতার লোভে। আবার কেউ নবাবের প্রতি হিংসায়। একটা জাতির প্রতি হিংসায়।

এসব মুনাফিক আর নিমকহারামদের প্রায় সবাই ছিলো নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার রাজদরবারের বড় বড় কর্মচারী। কেউ মন্ত্রী। কেউ সভাসদ। কেউ সেনাপতি। কেউ বড় ব্যবসায়ী আবার কেউ নবাবের খুব কাছের মানুষ।

দুষ্টুবুদ্ধি ইংরেজ এ সুযোগ হাতছাড়া করলো না। ষড়যন্ত্রের জাল বড় হতে থাকলো।

খারাপ লোকেরা সব সময়ই কথা আর কাজের কোনো মিল রাখে না। ইংরেজদের বেলায়ও তা'ই হলো। তারা বলেছিলো এদেশে তারা শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যই করবে, অন্য কিছু নয়। কিন্তু তারা নবাবের সিংহাসনের দিকে হাত বাড়ালো। আসলে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলো তাদের ভাওতা। তারা কলকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম' নামে একটা দুর্গ তৈরি করলো। নবাব নিষেধ করলেন। কিন্তু তারা নবাবের কথা কানেই নিলো না। তারাই যেনো এদেশের মালিক এমন একটা ভাব।

বিদেশী বণিকদের এ-রকম ঔদ্ধত্য দেখে গোস্বায় নবাবের রক্ত টগবগ করে উঠলো। তিনি কলকাতা আক্রমণ করে ইংরেজদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। রাজা মানিক চাঁদকে কলকাতায় রেখে নবাব চলে এলেন।

www.pathagar.com

এদিকে কিন্তু ষড়যন্ত্রের জাল অনেকটাই বোনা হয়ে গেছে। জগৎ শেঠের নিশাপুরের গদিতে প্রতিরাতেই ষড়যন্ত্রের গোপন সভা বসছে। সেখানে আসছে ইংরেজ প্রতিনিধি ক্লাইভ আর উমিচাঁদ, দুর্লভ রায়, রাজবল্লভ, মানিক চাঁদ; কখনো কখনো মীরজাফর, ইয়ার লতিফরা।

এ ষড়যন্ত্রে সিরাজের খালা মেহেরুন্ নিসাও যোগ দিলেন। ইতিহাসে তিনি ঘসেটি বেগম নামে পরিচিত। সিরাজের সাথে তাঁর ছিলো পারিবারিক ঝগড়া। নবাবী নিয়ে ঝগড়া। তারা ঠিক করলো, সিরাজউদ্‌দৌলাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে সেখানে বসানো হবে মীর জাফর আলী খাঁকে। এতে মীর জাফর মনে মনে খুব খুশি হলো।

আসলে মীর জাফর ছিলো লোভী মানুষ। বুদ্ধি-বিবেচনাও তেমন ভালো ছিলো না। নবাব হবার লোভে মীরজাফর ইংরেজ আর জগৎ শেঠদের ফাঁদে পা দিলো। মীরজাফর তখন নবাবের প্রধান সেনাপতি। ষড়যন্ত্রকারীরা জানতো, তাকে হাত না করতে পারলে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। যদিও ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক ছিলো রাজা রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ আর দুর্লভ রায়রা। মীরজাফর ছিলো তাদের হাতের পুতুল মাত্র। এমনি করে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা প্রায় শেষের পথে।

সেনাপতি মীর মদন আর মোহনলাল ছিলো সিরাজ-উদ্-দৌলার খুব ভক্ত। সিরাজও তাদের ভালোবাসতেন আপনজনের মতো। এই দুই বীর সেনাপতি প্রথম আক্রমণ করলেন। আর নবাবের ফরাসী সেনাপতি মঁসিয়ে লালীও তাদের সাথে যোগ দিলেন। তাদের আক্রমণে ক্লাইভ চোখে সরষে ফুল দেখলো। কিন্তু অন্যদিকে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খাঁ, সেনাপতি ইয়ার লতিফ, দুর্লভ রায় হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলো। কেউ নবাবের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করলো না। সিরাজ দেখলেন এ সব; কিন্তু তখন তাঁর কিছু করার ছিলো না। ক্লাইভের স্বপ্ন যখন ডুবছে, ষড়যন্ত্রকারীদের স্বপ্নও ডুবছে; এমন সময় বীর মীর মদন আহত হয়ে মারা গেলেন।

www.pathagar.com

সিরাজের মনের ভিতর তখন একটা দুঃখের নদী হু হু করে বইছে। সাথে একটা অজানা আশংকাও নানার কথা মনে পড়লো বার বার। মোহনলাল বীরের মতো যুদ্ধ করছেন। ততোক্ষণে ক্লাইভের যুদ্ধসাধ মিটে যাচ্ছে। ক্লাইভ পিছু হটছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

ষড়যন্ত্রকারীরা দেখলো মহাবিপদ ! কি করা। আবার নতুন করে ষড়যন্ত্রের জাল। তরুণ নবাবকে সত্য-মিথ্যা বুঝিয়ে তখনকার মতো যুদ্ধ থামিয়ে দেয়া হলো। মীরজাফর আর জগৎশেঠ নবাবকে বুঝালো, এখন রাত হয়ে গেছে। আগামীকাল আমরা সবাই মিলে যুদ্ধ করবো। ইংরেজ আর ক'জন ! ফু দিয়েই তাদেরকে উড়িয়ে দেয়া যাবে। নবাবও সরল মনে তাদের কথা বিশ্বাস করলেন। যুদ্ধ বন্ধের হুকুম দিলেন। যুদ্ধ থেমে গেলো।

রাত গভীর থেকে আরো গভীর হচ্ছে। ক্লাইভের চোখে কিন্তু ঘুম নেই। ঘুম নেই ষড়যন্ত্রকারীদের চোখেও। জগৎশেঠের ইংগিতে ক্লাইভ নবাবের প্রয়া ঘুমন্ত শিবির আক্রমণ করলো। নবাবের সৈন্যরা কিছুই বুঝলো না। ভয়ে তারা এদিক-সেদিক পালাতে লাগলো। সিরাজ বুঝলেন ব্যাপার। কিন্তু কিছু করার নেই। তিনি নিরুপায় ! বেড়া যদি ফসল নষ্ট করে তখন আর কিইবা করার থাকে ! সিরাজউদ্‌দৌলাও পলাশী থেকে সরে পড়লেন। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় সিরাজের বিশাল বাহিনী ইংরেজের কাছে হেরে গেলো; ষড়যন্ত্রকারীদের কুট বুদ্ধির কাছে পরাজিত হলো। ক্লাইভ লুট করলো বাংলার স্বাধীনতার সুরুজ। সময় সতের শ' সাতান্ন সালের তেইশে জুন।

সিরাজউদ্‌দৌলা পালিয়ে গেলেন। আশা আবার যুদ্ধ করবেন। কিন্তু যুদ্ধ আর করা হলো না। তিনি বন্দী হলেন মীর জাফরের জামাই মীর কাশিমের হাতে, শাহপুর গ্রামের এক মসজিদে। শাহপুর হিন্দুস্থানের মালদহ জেলার একটা গ্রাম। এরপর ক্লাইভের ইংগিতে মীর জাফরের পুত্র মীরণ সিরাজউদদৌলাকে হত্যার ব্যবস্থা করলো। মেহেদী বেগ নামে এক নিমকহারাম (যাকে সিরাজেরই অনুরোধে আলীবর্দী খাঁ

www.pathagar.com

লালন-পালন করেছিলেন) বাংলা-বিহার -উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাবকে বিষাক্ত ছুরি দিয়ে হত্যা করলো। তখন সময় ছিল সতের শ' সাতান্ন সালের ৪ জুলাইর সকাল।

তারপর। যারা বাংলার নবাবকে হত্যা করলো, যে সব নিমকহারাম দেশের সাথে বেঈমানী করলো, দেশের জনগণের সাথে বেঈমানী করলো, যারা দেশের স্বাধীনতাকে বিদেশীর হাতে তুলে দিলো, তারা কেউই কিন্তু আল্লাহ্‌র গজব থেকে বাঁচতে পারলো না। তাদের সবার ওপরই নেমে এসেছিলো আল্লাহ্‌র গজব। আল্লাহ্ কোনো অন্যায়ই সহ্য করেন না।

প্রথমে মীরজাফরের কথা বলা যাক। মীরজাফর নবাব হলো। কিন্তু নামে মাত্র। আসল নবাব থাকলো ক্লাইভ। ইংরেজ। তাদের কথামতো তাকে চলতে হতো। নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা তার থাকতো না। তার স্বপ্ন স্বপ্ন হয়েই থাকলো। তারপর এলো আল্লাহ্‌র গজব। কুষ্ঠ রোগে অনেক কষ্টের পর তার মৃত্যু হলো। তার ছেলে মীরণকে ইংরেজরা শরীরে এসিড ঢেলে মেরে ফেললো। আর এক ছেলে নাযিমুদ্দৌলা মারা গেলো নিউমোনিয়ায়। ছোট ছেলে মরলো বসন্তে ! এভাবেই শেষ হলো বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। মীরজাফরের বংশ।

সিরাজের হত্যাকারী মেহদী বেগ একদিন পাগল হয়ে গেলো। সে আত্মহত্যা করলো কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে।

সেনাপতি ইয়ার লতিফ নিরুদ্দেশ হলো। কেউ জানলো না তার খবর, জীবিত না মৃত।

রায় দুর্লভ মারা গেলো জেলখানায় স্বাস্থ্যহীন হয়ে। অনাহারে। অর্ধাহারে।

সুদখোর উমিচাঁদ মারা গেলো নিঃসম্বল হয়ে। এককালের কোটিপতি পথের পাশে পড়ে মরে থাকলো। কেউ তার খবরও নিলো না।

www.pathagar.com

নবাবের নায়েব রাজবল্লভের শিরচ্ছেদ করলো ঘাতক, মীর কাশিমের হুকুমে। এই রাজবল্লভ নবাবের ধনরত্ন লুটে লুটে রাজা বনেছিলো। তার ছেলে কৃষ্ণবল্লভ তখন ইংরেজের আশ্রয়ে। এই চুরি করা টাকা দিয়ে রাজবল্লভ তার রাজনগরের প্রাসাদ আর হিন্দুস্থানের বিখ্যাত এগারোরত্ন মন্দিরটি তৈরি করেছিলো।

মাহতাব চাঁদ, জগতশেঠ আর তার ভাই রূপচাঁদকে মীর কাশিম মুঙ্গের দুর্গের চুড়া থেকে গঙ্গার পানিতে ফেলে দিলো। পানিতে ডুবে ডুবে তারা মরলো।

সিরাজের খালা ঘসেটি বেগমকে ঢাকার জিঞ্জিরার কাছে পানিতে ডুবিয়ে মারা হলো। মারলো ইংরেজরাই।

মীর কাশিম আলী খাঁও আল্লাহ্‌র গজব থেকে রেহাই পেলেন না। এককালের নবাব মারা গেলেন নিঃস্ব হয়ে। দিল্লীর শাহী মসজিদের তোরণদ্বারে পড়েছিলো তাঁর লাশ। মরার সময় তাঁর সম্বল ছিলো একটিমাত্র পুরোনো শাল। এই শালটিতে সোনালী সুতায় লেখা ছিলো, 'নাসীরুলমূলক ইমতিয়াজুদ্দৌলা নুসরাতজঙ আলীজাহ মীর কাশিম আলী খাঁ বাহাদুর'। শালটা না থাকলে হয়তো কেউ কোনোদিন জানতো না এ লাশ কার। মীর কাশিম অবশ্য কিছুদিন পর বুঝেছিলেন, তিনি অন্যায় করেছেন। নবাব হয়ে তিনি ইংরেজকে তাড়াতে চেয়েছিলেন এদেশ থেকে। তিনি বুঝেছিলেন, ইংরেজ এদেশের বন্ধু নয়। কিন্তু পারলেন না। আবার ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর পেছনে লাগলো। জাতিগত হিংসা জগৎশেঠদের ঘাড়ে আবার চাপলো। মীর কাশিমকেও তারা শান্তি দিলো না। মীর কাশিমের শক্তি ইংরেজ থেকে বেশি। তবু তিনি ইংরেজের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। হারানো স্বাধীনতা আবার ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। দুর্লভ রায় আর জগৎশেঠদের ষড়যন্ত্রে মীর কাশিমও পরাজিত হলেন। কিন্তু মীর কাশিম তাঁর পুরোনো পাপের জন্য আল্লাহ্‌র গজব থেকে রেহাই পেলেন না।

www.pathagar.com

এভাবেই সব পাপীরা ডুবলো। পাপের নদীতে ডুবলো। আর সাথে ডুবলো দেশ। দেশের মানুষ। দেশের স্বাধীনতা। সুখ। শান্তি। যে জাফরগঞ্জ প্রাসাদে সিরাজউদ্‌দৌলাকে হত্যা করা হয়েছিলো, সে প্রাসাদও একদিন ভেঙ্গে গেলো। বজ্রপাত হলো সে প্রাসাদে।

যারা দেশের সাথে বেঈমানী করে, দেশের স্বাধীনতাকে বিদেশীর হাতে তুলে দেয়, তাদের ওপর আল্লাহ্‌র গজব এভাবেই নামে। তাদের শাস্তি আল্লাহ্‌ এভাবেই দেন। আগামীতেও দেবেন এভাবে। ইতিহাস এর সাক্ষী।

আল্লাহ্‌ গজবের ঢল নামিয়েছিলেন। এ-ঢল পাপী ক্লাইভকেও ভাসালো। স্রোতের পাকে নিঃসহায় ক্লাইভ ডুবলো। পাতালে ডুবলো। বিলাতের টেম্‌স নদীর স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিলো ক্লাইভ।

আমরা তো ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্‌র গজব থেকে বাঁচতে পারি। গজবের ঢলকে রহমতের ঢল বানাতে পারি। নিজের দেশকে ভালোবেসে। দেশের মানুষকে ভালোবেসে। সত্যকে ভালোবেসে। সে পথে আল্লাহ্‌র রহমত হু হু করে বইছে।

www.pathagar.com

নয়াবাড়ি ছাড়তে হলো। না ছেড়ে উপায়ও ছিলো না। এতো দুশমনের আড্ডায় কি করে টিকা যায়? আপন সমাজের লোক তো আছেই, তারপর আবার দুশমনী শুরু করলো জমিদাররা। ষড়যন্ত্র শুরু করলো। বাধা দিলো চলতে-ফিরতে। উঠতে-বসতে।

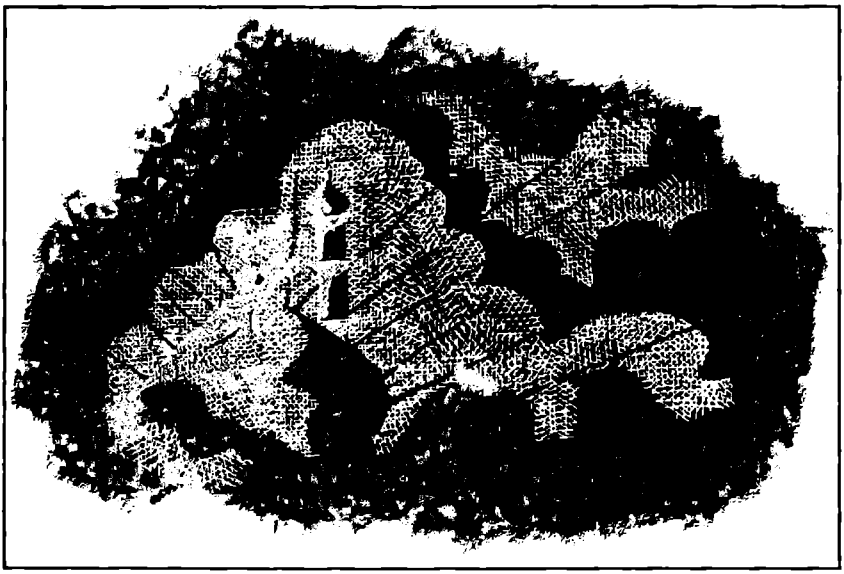

একটি মানিক জ্বলে

কাজ-কামের বড় সড় ঘাটি ছিলো এ নয়াবাড়ি। বলা যায় প্রধান অফিস। দুর্গ। এখান থেকেই প্রচার চালাতেন। বুঝ-পরামর্শ করতেন। শিষ্য-শাগরেদদের আদেশ-উপদেশ দিতেন। ভালো কাজের। ধর্মের। ঘর-সংসারের। দেশ-দুনিয়ার। মোট কথা ইসলামের। দলে দলে শামিল হচ্ছিলো মানুষ। শুনতে। বুঝতে। আর কাজের সড়কে পা'য়ের গোড়ালিকে শক্ত করে

www.pathagar.com

দাঁড় করাতে। জমিদাররা দেখলো মহাবিপদ! আর বসে বসে ডিমে তা দেয়া ঠিক হবে না।

বাচ্চা সব ফুটে গেলে সর্বনাশ! ফোটার আগেই ডিম ভাঙতে হবে। উঠে-পড়ে লাগলো তারা। জমিদাররা। জমিদাররা ছিলো প্রায় সবাই ভিন্ন জাতের মানুষ। জাতিগত রিশ তো একটা আছেই। তাই তারা নয়াবাড়ির শিষ্য শাগরেদদের উপর অত্যাচার শুরু করলো। তাদের নেতাকে নানাভাবে নাজেহাল করলো। তাদেরকে ঠাণ্ডা করার কোন কায়দা-কানুনই বাদ রাখলো না। এমন কি প্রভু ইংরেজকেও সত্যমিথ্যা বুঝিয়ে দলে ভিড়ালো। একদিকে জমিদার-ধনীরা, অন্যদিকে ইংরেজ-দেশের শাসক। এরাই যখন শত্রু, কি আর করা। নয়াবাড়ি ছেড়ে চলে এলেন ফরিদপুর। আপন জেলায়।

সৎ কাজে শত বাধা। কিন্তু তাই বলে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিলে তো আর চলে না ! কাজ করতে হয়। আগে বাড়তে হয়। সাহসের শিরদাঁড়া শক্ত করে। ভয় তো কেবল আল্লাহ্‌কে। মুসলমানের এ একটি খবরই জানা। তিনিও তাই করলেন। নতুন করে কাজে নামলেন। আবার। ডেকে-ডুকে জড়ো করলেন শিষ্য-শাগরেদদের। বাঁধলেন মজবুত করে নতুন দুর্গের দেয়াল। আন্দোলনের প্রাচীর। ইতিহাসে এ আন্দোলনের নামই ফরায়েজী আন্দোলন আর হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ছিলেন এ আন্দোলনের মূল নায়ক। সেনাপতি। নেতা। নয়াবাড়ি ছাড়তে হয়েছিলো তাঁকে দুশমনের ষড়যন্ত্রে। অত্যাচারে।

বাহাদুরপুর ছিলো হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌র বাড়ি। বাহাদুরপুর মাদারীপুরের একটি গ্রামের নাম। তাঁর বাপ-দাদারা ছিলেন শামাইল গ্রামের বাসিন্দা। বেশ কয়েক পুরুষ ধরেই তাঁরা সে গ্রামে। ধান আর কাউনের গন্ধ শুঁকে শুঁকে। শামাইল গ্রামটিও মাদারীপুরেরই একটি এলাকা। আগে অবশ্য সবগুলো জায়গাই ছিলো ফরিদপুরের সীমানায়। ফরিদপুর যখন বড়সড় জেলা, তখন।

www.pathagar.com

কয়দিন পর। শরীয়তউল্লাহ্‌রা উঠে আসেন বাহাদুরপুর। শামাইল ছেড়ে। নতুন ঘর। নতুন বাড়ি। পরিবেশও নতুন। এ নতুন আলো-বাতাসেই বড় হয় বয়সের কুঁড়ি, শরীয়তউল্লাহ্‌র।

শরীয়তউল্লাহ্‌ যখন এ দুনিয়ার মাটিতে পিঠ-রাখেন, সময়ের ক্যালেণ্ডারে বাংলা সনের এগারশ' ছিয়াশি। আর ইংরেজি তারিখ সতের-' একাশি খৃস্টাব্দ। আব্বা-আম্মা শামাইলেই থাকেন। তখনো তাঁরা বাহাদুরপুরে পা ফেলেন নি। তবে একটা কথা। হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌র এ জন্ম সময়টি কিন্তু অনুমান করে ঠিক করা হয়েছে। একেবারে দিনক্ষণ গুণে-টুনে বলা যায় নি। কারণ সবাই তো আর জন্মতারিখ লিখে-টিখে রাখে না। তাছাড়া সেই কবেকার কথা। বড়জোর দু'একদিন আগে অথবা দু'একদিন পেছনে। তফাতটা এই যা। অনুমান থেকে।

আব্বার নাম আবদুল জলীল। ঘর-সংসার দেখেন। হাল-গেরিস্তি করেন। মাথার উপর বটগাছের ছায়া। চিন্তা নাই। ভাবনা নাই। হেসে-নেচে দিন কাটে শরীয়তউল্লাহ্‌র। কালো রাত ধলা হয়। সময়ের পাতা ঝরে ঝরে পড়ে। আর অন্যদিকে হৃষ্টপুষ্ট হয় বালক শরীয়তউল্লাহ্‌র মন মগজ শরীর।

ছায়া ছায়া গ্রাম বাহাদুরপুর। সারি সারি সুপাড়ি গাছ। ছুঁই ছুঁই করে আসমান। কোন পাড়ায় নারিকেল বাগন। দাঁড়িয়ে আছে ঠাঁই। কার যেনো অপেক্ষায়। আমপাতার ফাঁক থেকে চুঁইয়ে পড়ে হলদে রোদ। বাতাসে টুক্‌ টুক্‌ গন্ধ। শীত সকালে শিশিরমাখা মুশুরী লতা। তাতে আছে ফুল। নীল টুক্‌ টুকে ফুল। আর আছে রাক্ষুসে গাঙ। নাম আড়িয়াল খাঁ। ফুলে ফুলে ওঠে ঢেউ। সাপের ফণার মতো। সে ঢেউয়ের ফণায় নাচে কতো ডিঙি। কতো নাও। ছোবলে ছোবলে নীল হয় কতো গাঁও। কতো হাসি হাসি জনপদ। সে সব দেখে দিন যায় শরীয়তুল্লাহ্‌র।

www.pathagar.com

নসিব মন্দ হলে হাসির দিনও এক সময় বাসি হয়ে আসে। শরীয়তউল্লাহ্‌রও তাই হলো। আব্বা ইনতেকাল করলেন আত্‌কা। বলা নাই কওয়া নাই ধপ করে নিভে গেলো বাতি। সুখ-স্বপ্নের চেরাগ। বয়স তখন আট। শৈশবের সবুজ সবুজ দিনগুলো ফিকে হয়ে আসে। চোখের পাতায় আঁধারের লুকোচুরি। আর মনের ভেতর দুখের বিশাল রাত। যেনো ভোর হতে চায় না আর।

ভোর হলো। চাচা আজিমউদ্দীন শরীয়তউল্লাহ্‌র ভার নিলেন। আজিমউদ্দীনও হাল-গেরস্তি দেখেন। জমি-জিরাত করেন। কোনমতে চলে যায় সংসার। এতিম বালক চাচার আদর-যত্নেই বাড়তে থাকেন। আব্বার অভাব বুঝতে দেন না চাচা। শরীয়তউল্লাহ্‌ও চাচা আজিমুদ্দীনকে আব্বার মতোই মান্যগণ্য করেন। ভালোবাসেন। চাচার কাজ-কামে হাত লাগান। পাশাপাশি হাঁটেন। আপদে-বিপদে। আর উলটে-পালটে দেখেন বই-পত্র। কায়দা সিপারা অ আ। অবসর সময়।

বয়স যখন বার, সেই বালক বয়সেই ঘর ছাড়লেন। বাড়ি ছাড়লেন। গ্রাম ছাড়লেন। সবুজ গ্রাম। পা বাড়ালেন অজানার পথে। চাচার আদর-যত্মকে পেছনে ফেলে। পেছনে ফেলে কদম ফুলের মতো শৈশবের প্রজাপতি সময়। বুকের ঘরে আশার ঝিলমিলে সায়র। বড় হবেন। অনেক বড়। জ্ঞানে-গরিমায়। তারপর। অন্ধকার কুয়ায় ডুবে থাকা আপন সমাজকে তুলে আনবেন আলোতে। নিভে থাকা চেরাগটা জ্বালিয়ে দেবেন আবার। সে সমাজের দেমাগে। এ অজ পাড়াগাঁয়ে আর নয়। ইচ্ছার পালকগুলো ছড়িয়ে দিলেন। উড়াল দিলেন আকাশে। উধাও নীলে। যোজন যোজন মাঠ বন পাহাড় আর ছলাত ছলাত পানির ঢেউ ভেঙে ভেঙে পৌঁছলেন সোজা কলকাতায়। সময়ের খাতায় তখন সতেরশ' তিরানব্বই সাল।

বিরাট শহর কলকাতা। কলকাতা শহরটি এখন পশ্চিম বাংলার রাজধানী। পড়েছে হিন্দুস্থানে। যে কালের কথা, তখনো কিন্তু কলকাতা ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজধানী। কলিজার টুকরা। এখানে বসে সভা-

www.pathagar.com

সমিতি। চলে সলা-পরামর্শ। হয় আদান-প্রধান ভাবের। জ্ঞানী-গুণীরা থাকেন এ শহরে। কতো গাড়ী। কতো বাড়ি। কতো ঘোড়া। কতো মানুষ। এক এলাহি কাণ্ড আর কি।

শরীয়তউল্লাহ্ হাঁটেন আর সে সব দেখেন। অবাক অবাক চোখে চোখ রাখেন বড় বড় দালানের চূড়ায়। দরজায়। জানালায়। দেখতে দেখতে ভাবনায় ডুব দেন এক সময়। এইতো কয়েক বছর আগের কথা। রাজা-বাদশারা হাঁটতেন এ শহরে। বুক চিতিয়ে। আগে-পিছে থাকতো সেপাই-লস্কর। আমীর-ওমরা। হাতী-ঘোড়া। কেঁপে উঠতো দুশমনের বুক। বুঁজে আসতো সাহসের চোখ। গা ঢাকা দিতো। চোরের মতো। জান নিয়ে। মুরুব্বিরা বলতেন এসব কাহিনী। সিনার ভিতরে তখন বইতো ঝড়। উথাল পাথাল ঝড়। সে সব রাজা-বাদশারা নাকি তাদেরই আপনজন। দাদা বাপ ভাই।

কিন্তু এ দেশের মালিক এখন দুশমন ইংরেজ। সাত সুমুদ্দুর তের নদীর ওপারে যাদের ঘর-বাড়ি। ছল-চাতুরী চুরি-জোচ্চুরি কোনটাতেই তাদের জুড়ি নেই। এ পথে হেঁটে হেঁটেই তারা এ দেশের সিংহাসনটা কবজায় নিয়েছিলো। আর একাজে যারা দুশমন ইংরেজের পাশাপাশি চলতো তারা ছিলো এ দেশেরই মানুষ। একপাল নিমকহারাম। খারাপ লোক। তারা ছিলো ধুরন্ধর। দালাল। লোভী। জগতশেঠ রায়দুর্লভ আর মীরজাফর তাদের নাম।

কলকাতা শহরে এখন দুশমনের রাজত্ব। আর রাজত্ব রায়দুর্লভ-জগত শেঠদের। তারা হাত রাখছে সোনা-দানার মটকায়। মোটা করছে পেট ঘাড় গাল। অন্যদিকে হাড্ডির সাথে মিশছে চামড়া শরীয়তউল্লাহ্র বাপ-ভাইদের। তাঁর সমাজের। যারা সেদিনও ছিলো এদেশের মালিক। রাজা। বাদশা। মুরুব্বিরা বলতেন আরো কতো কি।

ভাবনারা আর এগোতে চায় না। কেঁপে কেঁপে ওঠে গতর। মন। ঢাল তলোয়ার ঘোড়া বন্দুক কামান ভেসে ওঠে চোখের তারায়। আবার লড়াই করতে হবে। মনের সাথে বুঝ-বিবেচনা করে দেখলেন- এ জন্যে

www.pathagar.com

শুরুতে দরকার শিক্ষা। সঠিক জ্ঞানের। যে জ্ঞান নিজেকে চিনতে শেখায়। বুঝতে শেখায় আপন সমাজের সুখ-দুখ। ইতিহাস। আচার আচরণের চকচকে সিঁড়িগুলো। বড় কথা- মানুষ করে যে জ্ঞান। শরীয়তউল্লাহ্ তো ঘর ছেড়েছেন এ জন্যেই। পা রেখেছেন বিদেশ বিভুঁই-এ।

শিখতে গেলে শিক্ষক দরকার। উস্তাদ দরকার। যার জ্ঞানের থলিতে ঝোলে সোনালী ঝালর। বিদ্যার রোশনী। কলকাতায় এসে শরীয়তউল্লাহ্ উস্তাদ ধরলেন। নাম মওলানা বাশারত আলী। নামি-ডাকি মানুষ। বিদ্যাবুদ্ধিওয়ালা মানুষ। দেশ-বিদেশ থেকে আসে ছাত্র তাঁর কাছে। বুঝতে। শিখতে। আর তিনি জ্ঞানের রেণুগুলো রেখে দেন তাদের মগজের খুপড়িতে। চোখের জ্যোতিতে। যতন করে। শরীয়তউল্লাহ্ বাশারত আলীর ঘরেই উঠলেন। থাকলেন কিছুদিন। শিখলেন কুরআন-হাদীস। শিখলেন ধর্মের নানা নিয়ম-কানুন। আর শিখলেন দেশ-দুনিয়ার বিষয়-আশয়। এ শেখা-শিখিতেই কেটে গেল বেশ ক'টা দিন। তারপর ভর্তি হলেন হুগলী মাদ্রাসায়। মাওলানা বাশারত আলীই তাঁকে ভর্তি করলেন সেখানে। আরো বেশি বেশি জ্ঞান যেখানে জমা আছে। হুগলীর ফুরফুরায় ছিলো সে মাদ্রাসা। হুগলী আর ফুরফুরা দু'টি এলাকাই এখন হিন্দুস্থানের অংশ।

মওলানা মুহাম্মদ আশেক শরীয়তউল্লাহ্র আরেক চাচার নাম। থাকেন মুর্শিদাবাদ। সেখানকার নবাবের মুফতি তিনি। জ্ঞান-গরিমায় তারও কমতি নেই। বাংলা আরবী উর্দু ফার্সী সব ক'টাতেই তার সমান দখল। মুফতি হওয়া তো আর যা তা কথা নয় ! ধর্মীয় বিষয়াদিতে যাদের থাকে অগাধ জানাশোনা। ইসলামের রগরেশা যারা চেনেন বোঝেন ভালো করে, তাঁরাই মুফতি হবার উপযুক্ত। মুহাম্মদ আশেক ছিলেন তেমনি একজন উপযুক্ত মানুষ। শরীয়তউল্লাহ চলে গেলেন চাচার ছায়ায়। যখন হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র। থাকলেন বছর দু'এর মতো। ওজনদার চাচা। নিজের জ্ঞানের গোলা থেকে সব উজাড় করে

www.pathagar.com

দিলেন ভাতিজার থলিতে। সেখানেই শরীয়তউল্লাহ্ তাঁর জানাশোনার দেয়াল মজবুত করে গেঁথেছিলেন।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো সুরুজই আসা-যাওয়া করলো। পূবে-পশ্চিমে। শরীয়তউল্লাহও বড় বড় বইপত্রের পাতা ঘেঁটে ফেলেছেন ইতোমধ্যে। তবু আরো জানতে ইচ্ছা করে। খায়েশ মিটে না। বুকের ভিতর কিসের যোনো তিয়াস। এ তিয়াস বুকে পুষে ফিরে এলেন কলকাতায়। আবার পুরোনো উস্তাদ মওলানা বাশারত আলীর ঘরে। উস্তাদ বুঝলেন তাঁর শাগরেদের মনে কিসের তুফান। মক্কা যাবেন, হজ্জ করবেন, মনস্থির করে ছিলেন মওলানা বাশারত আলী আগেই। সে খবর তার শাগরেদকে জানালেন। ইচেছ করলে সঙ্গী হতে পারে। সে খবরও দিলেন। শরীয়তউল্লাহ্ রাযি হয়ে গেলেন। মক্কা যাবেন, হজ্জ করবেন, আল্লাহ্র ঘর দেখবেন। সেখানকার জ্ঞানের বাগান থেকে তুলে আনবেন সুগন্ধি ফুল। রঙমাখা ফুল। সে ফুলের গন্ধ মাখবেন নিজের মনে-মগজে। মানুষের মনে-দিলে। যেন খুশি আর ধরে না। উস্তাদের সাথে রওয়ানা হলেন একদিন। মক্কার পথে। শুভক্ষণে শুভদিনে। তখন রীতিমত যুবক। বয়স আঠার। আর সময়টা ছিলো সতেরশ' নিরানব্বই।

মক্কায় এসে পৌঁছালেনও একদিন। সহি-সালামতে। রহমতের জাফরানী মেঘ ঝুর ঝুর করে পড়ে এখানে। জোসনার নদীতে ডুব দেয় চাঁদ। আবার ভাসে নীলের দরিয়ায়। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। গতর ভরা পাথর আর কাঁকর নিয়ে। আছে আল্লাহ্র ঘর কা'বা। টানটান করে বুকের পাটা। কলিজার টুকরা এ কা'বা। চোখের মণি এ কা'বা। তামাম দুনিয়ার মুসলমানের। ঈমানদার মানুষের। তারা আসে পাহাড় পর্বত নদী সাগর বন জঙ্গল পার হয়ে এ মক্কায়। সারা পৃথিবীর গ্রাম-গঞ্জ থেকে। শহর-বন্দর থেকে। আল্লাহ্র আশায়। আল্লাহ্র রহমতের আশায়। শরীয়তউল্লাহ্ও এসেছেন আল্লাহ্র ভালোবাসাকে সাথী করতে। মনের ভিতর ঈমানের বাতিটা জ্বালিয়ে নিতে। যার শিখা

www.pathagar.com

জ্বল জ্বল করবে আমরণ। আল্লাহ্‌র আইন কানুনগুলো ঘেঁটেঘুটে দেখতে। জানতে। বুঝতে। আর ভালোভাবে শিখতে।

নিজে নিজে তো আর সবকিছু শিখে ফেলা যায় না। একা একা বোঝাও যায় না ঠিকঠাকভাবে। বুঝে নিতে হয় কারো কাছে। বইপত্রে তো লেখা থাকে কতো কিছু। তাতে কি? বই-এর লেখাকেই আবার ঝালাই করতে হয় স্কুলে-মাদ্রাসায়। মাস্টার-মওলানার কাছে। শরীয়তউল্লাহ্‌ও তেমনি একজন মাস্টারের হাতে হাত রাখলেন। সোজা কথা উস্তাদের কাছে পাঠ নিলেন। শায়খ তাহির আসসুম্বল আল-মক্কা উস্তাদের নাম। জ্ঞানী মানুষ। গুণী মানুষ। শায়খ তাহিরও ছিলেন মুফতি। এতেই বোঝা যায় তাঁর জানাশোনার এলাকা কতো বড়। কতো জমকালো। উস্তাদ জ্ঞানের সোনালী রূপালী সিঁড়িগুলো চিনিয়ে দিলেন। ঘুরিয়ে আনলেন নবী-রসূলের হেঁটে যাওয়া অলিগলি। আল্লাহ্‌র কথাবার্তার ডাল পালা। মোটকথা ইসলামের আসল চেহারা লটকে দিলেন শরীয়তউল্লাহ্‌র চোখের সামনে, উস্তাদ।

যেমনি উস্তাদ তেমনি শাগরেদ। জ্ঞানের মুক্তাবোঝাই জাহাজটি ভিড়িয়ে ফেললেন খুব কম সময়ে শরীয়তউল্লাহ্‌। নিজের ঘাটে। এরপর উস্তাদ বনে গেলেন নিজেই। দু'একটি মাদ্রাসায় পড়ালেনও মক্কায়। শায়খ তাহিরের অনুরোধে। শিখলেন শিখালেন দেখলেনও অনেক। ঘুরে ঘুরে।

এ ঘোরাঘুরি আর দেখাদেখিতেই পার হলো গুণে গুণে কুড়িটা বছর। এরি ফাঁকে ফাঁকে হজ্জও করলেন কয়েকবার। রহমতের আশায়। দরদের আশায়। আল্লাহ্‌র। আর কতো, দেশে ফেরা দরকার। মনে তিয়াসে এখন থই থই পানি।

আঠারশ' চার সাল। দেশে ফিরলেন তিনি। নদী আর দুর্বা ঘাসের সাথে মাখামাখি হলো আবার। হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌ এখন তাঁর নাম। দেশ-বিদেশের মানুষ এ নামেই তাঁকে চেনে। ইতিহাসের পাতায় এ পরিচয়েই তাঁর হাঁটাচলা। লড়াই যুদ্ধ।

www.pathagar.com

প্রথমে পা রাখলেন বাহাদুরপুরে। আপন গ্রামে। যেখানে শৈশবের স্মৃতিগুলো ভাঙা ইটের মতো এ পাড়ায় সে পাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অবহেলায়। অনাদরে। শরীয়তউল্লাহ্ গ্রামে এলেন। কিন্তু কেউ চিনলো না, চাচা আজিমউদ্দীন ছাড়া। আসলে চেনার কথাও না। সেই কবে গ্রাম ছেড়েছেন। বালক বয়স তখন। আর এখন জোয়ান মানুষ। তারপর চেহারা সুরতেও কেমন কেমন। আলাদা আলাদা। এখানকার মানুষজনদের সাথে মিশখায়না কোনমতে। শক্তসামর্থ শরীর, মুখভর্তি দাড়ি, গায়ে পাঞ্জাবী, পরণে তহবন্দ। আর মাথায় জড়ানো ইয়াবড় পাগড়ি। পাঞ্জাবীর উপর আবার পরেছেন ছদরিয়া। ছদরিয়া অনেকটা হাত কাটা কোটের মতো। গ্রামের লোক কেবল তাকিয়ে থাকলো লাটিমের মতো বড় বড় চোখ করে। কারণ এমন পোশাক-আশাকের মানুষ তারা দেখে না বহুদিন। বহু বছর।

অবাক হলেন শরীয়তউল্লাহ্ও। তাদের হাবভাব দেখে। আচার-আচরণ দেখে। পোশাক-আশাক দেখে। কেমন যেনো অদল-বদল হয়ে গেছে সব। আলাদা করে চিনা মুশকিল। তারা মুসলমান, না অন্য কোন জাত।

দিনকয়েক পার হলো এভাবে। দেখলেন আর ভাবলেন। এরি মাঝে ইনতিকাল করলেন চাচা আজিমউদ্দীন। তাকে দাফন করতে গিয়েই খটকা লাগলো। চোখের নজরে জড়িয়ে গেলো ধাঁধার লম্বা সুতা। এ কি কাণ্ড লাশ নিয়ে? নানা আচার-অনুষ্ঠান করলো প্রতিবেশী হিন্দুদের মতো করে। গ্রামের লোক আর আত্মীয়-স্বজন মিলে। এতো মস্ত গুনাহ্র কাজ! বাধা দিলেন শরীয়তউল্লাহ্। ইসলামী নিয়মকানুন গুলো বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু কেউ শুনল না। বরং তাঁর উপর রাগ করলো। খাপপা হলো। 'ব্যাটা শিখাতে এসেছে দু'পাতা পড়েই।' বলেও ফেলল দু'একজন এমন কথা। কিন্তু শরীয়তউল্লাহ্ অটল। পাহাড়ের মতো। তখনই মনে মনে ঠিক করলেন কিছু একটা করতে হবে। এ অনাচার বরদাশত করা যায় না। সহ্য করা যায় না কোনভাবে! শক্ত হাতে উপড়ে ফেলতে হবে শিকড়। সব রকম

www.pathagar.com

অনাচারের। আগাছার। পরগাছার। যা কি না লেপটে আছে মুসলমানদের ধর্মের গতরে। কাজকামের ফাঁক-ফোকরে। মনের থলিতে। স্যাঁতস্যাঁতে শ্যাওলা যেমন লেপটে থাকে।

লেখাপড়া না থাকলে বুদ্ধির জমিনও থাকে ঠনঠনে। সেখানে ফসল জন্মাতে চায় না সহজে। বাংগালী মুসলমানের অবস্থাও অকেটা হয়েছিলো তাই। বিশেষ করে গ্রাম-গঞ্জের। তাদের ছিলো খুবই কাহিল দশা। যে যা বুঝাতো, তারা তাই বুঝতো। করতো। জানা শোনার অভাব। ধর্মে। কর্মে। আচারে। ব্যবহারে। কারণ বাপ-দাদার কাছে যতটুকু শুনেছে তারপরই তো শেষ। এরপর আছে ষড়যন্ত্র। ভুলিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র। পরিচয়কে মুছে ফেলার কায়-কারবার। মুসলমানদের শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখতে পারলেই যে কেল্লা ফতে। দুশমন ইংরেজ সে কথা বুঝেও ছিলো ভালোআবে। নেমেও ছিলো ময়দানে। আট-ঘাট বেঁধে। আর সাথে তাদের দোসর, জগতশেঠ-রায়দুর্লভের ভাই-ভাতিজা।

পথেঘাটে দেয়াল। হাঁটতে গেলেও হোঁচট। ফিরতে গেলেও হোঁচট। দুশমনের ফাঁদে আটকে গেলো তারা। বাংলার মুসলমানেরা।

শরীয়তউল্লাহ্ আঁচ করতে পারলেন ব্যাপার। তিনি কাজে নামলেন। বিশ বছর ধরে যে সব মণিমানিক্য জ্ঞানের বাক্স বোঝাই করে এনেছেন তার ডালা খুলে ধরলেন।

মুসলমান তার নাম নিশানা ভুলে যাচ্ছিলো। দিনকে দিন। হিন্দু সমাজের সাথে ওঠা-বসা প্রায় হররোজ। কাজে-অকাজে। তাই তাদের অনেক আচার-অনুষ্ঠান ঢুকে পড়ছিলো মুসলমানের ঘরে। গোপনে। মুখ ঢেকে। ঘটে বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকলে যা হয়। আপন ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে বেখেয়াল হলে যা হয়। ঘুণপোকা এসে ঘর বাঁধে মনে। গতরে। কেটে কেটে ঝাঁঝরা করে দেয় একদিন। ঘুণ পোকা কুট কুট করে কাটছে তখন।

মরা মানুষ নিয়ে হৈ-হুল্লা। কবর নিয়ে বিতিকিচ্ছি কাণ্ড। সাজিয়ে-গুছিয়ে সেখানে মাথা ঠুকে দলে দলে। বাতিটাতি জ্বেলে আসর জমায়

www.pathagar.com

কবরে। মানত করে সেখানে। সওয়াবের আশায়। গুনাহ্ মাপের আশায়। বলে মাজার পবিত্র জায়গা। আবার আর একদল খুলেছে হাট বাজার। সে হাট-বাজারে চলে পীর-মুরিদির ব্যবসা। কারবার। বাণিজ্য। লেনদেন। মুরিদরা পীরের পায়ে মাথা ঠুকে। সেজদা করে। দোহাই দেয় পীরের। আল্লাহ্কে পাশে রেখে। বিপদে-বিপাকে। পীররাও এতে খুশি। সাত-পাঁচ বুঝিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখে মুরিদদের। নিজের স্বার্থে।

আসলে সে সব পীররা ছিলো ভণ্ড। মিথ্যুক। মানুষ-জনদের ঠকাত ধর্মের নাম করে। তাদের বোকামীর সুযোগে। ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের সুযোগে। ইসলামী জ্ঞানের অভাবের সুযোগে। আর সেই ভণ্ড পীরদেরও যে সত্যিকারের ইসলাম সম্পর্কে কোনরকম জানাশোনা ছিলো, তাও কিন্তু না। তারাও ছিলো অজ্ঞ একেবারে। ইসলাম সম্পর্কে। ধর্ম সম্পর্কে।

শরীয়তউল্লাহ্ দেখলেন এসব। রক্তে তাঁর সাগরের ঢেউ। সর্বনাশ! এ যে রীতিমতো অন্যায়। আল্লাহ্র সাথে বেয়াদবি। শিরক্। মহাগুনাহ্র কাজ। যে গুনাহ্র মাফ নেই। মুসলমান তো মাথা ঠুকবে একমাত্র আল্লাহ্র কাছে। কিন্তু এ কি! ধর্মের নামে অধর্ম! সংস্কারের নামে কুসংস্কার! নাহ্! এ-সব চলতে পারে না। আল্লাহ্র সাথে সব বেয়াদবী বন্ধ করতে হবে। শরীয়তউল্লাহ্ তাঁর গলার আওয়াজকে বড় করলেন। হিন্দু সমাজ মূর্তিপূজা করে। মাটির মূর্তি। মূর্তির কাছে বর চায়। শক্তি চায়। মাথা ঠুকে। গুরুর পায়ে প্রণাম করে মাথা ঘষে ঘষে। তারা তো এসব করবেই। এগুলো তাদের আচার-অনুষ্ঠান। ধর্মের নিয়ম। তারা তাদের ধর্মের নির্দেশ মানে। তাই বলে মুসলমানও তেমনি করবে! কবর নিয়ে মাতামাতি- সে তো মূর্তিপূজারই শামিল। আর পীরপূজা-সে তো গুরুটুরুরই ডালপালা। মুসলমান সরাসরি আল্লাহ্র সাথে কথা বলবে। বিপদে। বিনাশে। আল্লাহ্র পাশে আর কাউকে খাড়া করা যাবে না। এ আল্লাহ্রই আদেশ। নবী-রাসূলের নির্দেশ। কিন্তু এ কথাগুলোই ভুলতে বসেছিলো অনেকে। তাই গুনাহ্র

www.pathagar.com

নর্দমাতেই চলছিলো তাদের দাপাদাপি। হাঁটা-হাঁটি। মোট কথা তারা হাঁটছিলো একেবারে উল্টা সড়কে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ডাকলেন তাদের। প্রথমে আত্মীয় স্বজন। তারপর গ্রামের লোক। ইসলামী আইন-কানুনের সবুজ সবুজ পাটাতনগুলো সাজিয়ে রাখলেন। বললেন মুসলমানের পথ-বিপথের ঠিকানা। হুঁশিয়ার করলেন আগাছা-পরগাছার ব্যাপারে। যা মনের ভিতর জমা হচ্ছে- আরামে। আয়েশে। তাকিদ দিলেন সাফ করার জন্যে এসব। আর তা না হলে সব অন্ধকার সংস্কারের নামে কুসংস্কার! এ হতে পারে না।

গাছেরও তো একটা পরিচয় থাকে। দেখলেই চেনা যায়। কারণ ফল আলাদা। বাকল আলাদা। গন্ধ আলাদা। আর কিসিম-কিসিম পাতা। কিন্তু বাংগালী মুসলমানের তখন কি রকম কি রকম অবস্থা। নামায-রোযায় ঠিকঠাক। আল্লাহ্ খোদার কথাও বলছে। আবার কালী পূজা-দূর্গা পূজা আর স্বরস্বতী পূজায়ও তারা আছে। আনন্দ ফুর্তি, হরিলুটেও তারা হাযির। কোমর বেঁধে। পোশাক-আশাকেও একই হালত। পরনে ধুতি, জামাটামাও সুবিধার নয়। আলাদা করে চেনাই যায় না। তেমন কোন কিছু ঝুলে না শরীরে। মনেও। ছেলে-সন্তানের নামধামও রাখে কেমন বেফাঁস। নাম শুনে কারো বাপের সাধ্য নাই তার পরিচয়ের আসল চেহারা কেউ তুলে আনে চট করে। কি তার ধর্ম। কি তার বিশ্বাস।

গাছের পরিচয় ফলে। ঠিক তেমনি মানুষের পরিচয়ও তার নাম। নামই বলে দেয় তার বিশ্বাসের কথা। আচার-ব্যবহারের গন্ধভেজা পাপড়িগুলোর রঙ-এর কথা। কিন্তু এখানেই গোলকধাঁধার গোল চাকতি ঘুর ঘুর করে। আর ধাঁধায় না জড়িয়েও বা উপায় কি। একজন মুসলমান যখন বলে তার নাম কিরণ হিরণ বাদল পাঁচ কড়ি দশ কড়ি অর্জুন বা পার্থ-তখন যোগ-বিয়োগের ফল মিলেই বা কি করে। জগা-খিচুরি অবস্থা আর কি। তবে মজার ব্যাপার, তারা কিন্তু কিছুই মনে করতো না, বিষয়টাকে। এ করে তারা যে নিজের আলাদা পরিচয়টাই

www.pathagar.com

ঘষে-মেজে মুছে দিচ্ছে, তাও তাদের দেমাগে আসতো না। আসলে এগুলোর গোড়ায় ছিলো শিক্ষার অভাব। বুঝ-বিবেচনার অভাব। নিজের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব। এ অভাবের ঝুল-কালি আজো কিন্তু উড়ছে। কোন কোন ঘরে। মনে। নাম-টাম রাখার ব্যাপারেও। দেমাগ খোলাশা করা যায়নি পুরাপুরি ঝুল কালির আড়াল থেকে। দেড়-দু'শ বছর পরও।

রঙ মেখে সঙ সাজতো তারা। হোলি খেলার মতো করে, হিন্দু সমাজের। বিপদে-বিপাকে দোহাই দিতো বদর পীর আর ওলা বিবির। সেই একই কথা। দেব-দেবীর কাছে সাহায্য চাওয়ার মতো ব্যাপার। আর একেই বলে কুসংস্কার। আগাছা-পরগাছা। বিয়ে-শাদিতেও নানা আচার-অনুষ্ঠানের বহর। হলদি-মরিচ মেখে-টেখে একেবারে একাকার। কুলায় ধান-দুর্বার ডালি। আরো কতো কি করতো। অপরের কাছে দেখে দেখে। যা কিনা মুসলমানের ধর্মের সাথে মিশ খায় না। বিশ্বাসের ঘরে যার কোন খোঁজ-খবর নেই। তবু তারা এসব করতো। খুশি মনেই করতো। না বুঝে। না জেনে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ্ তাঁর হাতের লাঠি ঠুকলেন জমিনে। ডাকলেন বেবুঝ মানুষগুলোকে। জ্ঞানের সোনা-দানা হাতে নিয়ে। তাদের বুঝালেন। সন্তানের মতো। ভাইয়ের মতো। সবাই শুনলো তাঁর কথা। মন দিয়ে। অনেকেই ভুলের চারা গাছ উপড়ে ফেলল শিকড়সহ। যা গজাচ্ছিলো এতদিন, মনের অন্ধকার ঘরটায়। তারা কাতারবন্দি হলো। তাঁর পেছনে। শরীয়তউল্লাহ্র পেছনে।

এমনি হযবরল অবস্থা কেবল ফরিদপুরেই নয় বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামগঞ্জের চেহারাই ছিলো এমন। বুঝদার মুসলমানের অভাব। এখানে-সেখানে, সবখানে। তিনি ঘুরলেন পায়ে হেঁটে হেঁটে সারা দেশ। ঘরের দরজায় দরজায় টাঙ্গিয়ে দিলেন ভালো-মন্দের লিষ্টি। ফরিদপুর বরিশাল-কুমিল্লা-মোমেনশাহী-ঢাকা সব এলাকায় গেলেন। হাতে আদেশ-উপদেশের সুবাসিত তশতরী। তিনি ঘুরলেন। ফিরলেন।

www.pathagar.com

তাঁর এ আনাগোনায় কাজ হলো। বাংলার মুসলমান তাদের ভুল বুঝতে লাগলো। ধীরে ধীরে। নিজের পরিচয়ের ভাঁজ নিজেই খুলতে শিখলো। তাঁর দল বড় হচ্ছে দিন দিন। তাই বলে সবাই কিন্তু তাঁর কথায় কান দিলো না। কিছু কিছু টেরা হয়ে থাকলো। অন্ধকারকেই ভালোবাসলো। তবে তারা ছিলো আংগুলে গোনা কয়েকজন।

শিষ্য-শাগরেদ বাড়ছে। বাড়ছিলো কাজের এলাকাও। সাথে সাথে কাজের সিঁড়িগুলোও উঁচা হচ্ছিলো। মোটামুটি সারাদেশেই একটা গমগমিভাব। শরীয়তউল্লাহ্ তাঁর এ কাজের ঢেউ দিয়েই তৈরি করলেন একটা আন্দোলন। নাম দিলেন 'ফরায়েজী আন্দোলন'।

একজন মুসলমানের অবশ্যই যা করা দরকার, সেগুলোর প্রতিই তিনি জোর দিলেন বেশি বেশি। আসলে যে কাজগুলোকে আল্লাহ্ ফরয করেছেন, যা না মানলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে জোড় হাতে, বড় কথা গুনাহ্ হবে শক্ত, ফরায়েজী আন্দোলনের নজর ছিলো সেগুলোর দিকেই। আর এ 'ফরয' থেকেই ফরায়জী। যারা আল্লাহ্র এ হুকুম পালন করবে সঠিকভাবে, তিনিই হবেন ফরায়েজী আন্দোলনের একজন সদস্য।

ফরিদপুর থেকে ঢাকায় এলেন। নয়াবাড়িতে খুললেন তাঁর আন্দোলনের প্রধান অফিস। ঘাঁটি। নয়াবাড়ি ছিলো ঢাকা জেলারই একটি এলাকা। সেখান থেকে তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরতে লাগলেন পায়ে হেঁটে। শিষ্য-শাগরেদরাও থাকছেন কতকজন। বরিশাল-খুলনা-কুমিল্লা-মোমেনশাহী তাঁর সফরের এলাকা। আরো অনেক জায়গাতেই গেলেন তিনি। মানুষজনকে শোনালেন তাঁর কথা। আল্লাহ্র কথা। রসূলের কথা। দু'টি ভাগ করলেন কু-অভ্যাসের-কুসংস্কারের। বাংলার মুসলমানরা যা করতো। একটি বেদাআত আর অন্যটিকে বললেন শিরক। বেদাআত-যাকে সহজ করে বলা যায় কুসংস্কার। আগাছা। পরগাছা। ইসলামী নীতি-টিতির সাথে যার কোন খাপ খায় না। সে সব নিয়ে মাতামাতি করা। সে সব কুখাসিলতকে নিজের বলে ভাবা। ঘরের

www.pathagar.com

খাট-পালংকে এনে তাজিম-তোয়াজ করা। আর শিরক তো সবচে বড় গুনাহ, ইসলামে। আল্লাহ্‌র চোখে।

আল্লাহ্ তো সবার উপরে। বড়। তুলনার কাতারে যাঁকে খাড়া করা যায় না। মানুষ তাঁকেই সিজদা করবে। মাথা নোয়াবে। মাফ চাইবে। অপরাধের। অন্যায়ের। আল্লাহ্‌ই তো ভরসা একজন মুসলমানের। একজন মানুষের। আর এ ভরসায় অন্য কাউকে শামিলের নামই হলো শিরক। যেমন পীর-ফকির আর মাজার-টাজারে যা হচ্ছিলো তখন। এখনো কোথাও কোথাও যা হয়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ্ এসবের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে বললেন। তাঁর শাগরেদদের। মুসলমানদের। তিনি পীর-মুরিদ শব্দটাও বাতিল করে দিলেন। সেখানে গেঁথে দিলেন উস্তাদ-শাগরেদ। শিক্ষক আর ছাত্রের যা সম্পর্ক। তিনি বললেন, পীর-মুরিদ শব্দে শিরক-এর গন্ধ আছে। তাই এ পথে হাঁটবে না। হাঁটা যাবে না। হাঁটলও না কেউ। যারা তাঁর হাতে হাত রেখেছিলো। চেহারা-সুরতই বদলে ফেললো তারা। একেবারে। উস্তাদের নির্দেশে। মুখে দাড়ি পরনে লুঙ্গি গতরে পাঞ্জাবী। আর চলনে-বলনে তো আলাদা কায়দা আছেই। মোটামুটি কথা হলো, একজন মুসলমান যেমন হওয়া দরকার তাই। এভাবে হাজী শরীয়তউল্লাহ্ তাঁর আন্দোলনের দেয়ালকে উঁচা করে ফেললেন। তখন ষাট হাজার মানুষ এক পায়ে দাঁড়ানো। কেবল হুকুমের অপেক্ষায়। উস্তাদের। হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌র।

ষড়যন্ত্র তখন চলছে পুরোদমে। ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক জমিদাররা। এ জমিদারদের প্রায় সবাই ছিলো অমুসলমান। হিন্দু। দু-একজন ধনী মুসলমানও আছে। যারা ফরায়েজী আন্দোলনকে ভালো নজরে দেখতো না। দেখতো না, কারণ স্বার্থে খোঁচা। তাছাড়া মনের গোলমাল তো ছিলোই। না বোঝার গোলমাল। এ গোলমালে আরো গোলা এসে ধাক্কা দিলো। শরীয়তউল্লাহ্ ঘোষণা করলেন এ দেশ দারুল হরব। অর্থাৎ শত্রু দেশ। বিধর্মীর দেশ। খৃস্টান এদেশের শাসক। মুসলমান নয়।

www.pathagar.com

তাই এদেশের মাটি আলো-বাতাস অপবিত্র। এ দারুল হরব-এ জুমআর নামায পড়া ঠিক না। না-জায়েয। ঈদের নামাযকেও তাই বললেন। আগে শত্রু হটাও। বিধর্মী হটাও। দেশ মুক্ত কর। পবিত্র কর। তারপর জুমা পড়। ঈদের নামায পড়। আমোদ কর। ফুর্তি কর। খুশির নিশান উড়াও। তবে তার আগে দেশ দুশমনমুক্ত করতে হবে। দুশমনের দখলে ঘর রেখে খুশি শোভা পায় না। এটা ভীরু কাপুরুষের কাজ। কিন্তু মুসলমান তো ভীরু কাপুরুষ হতে পারে না।

তাঁর শাগরেদরা করলোও তাই। উস্তাদের আদেশের পেছনেই তাঁরা হাঁটলো।

খাপপা হলো জমিদাররা। সাথে যোগ দিলো নীলকর সাহেবরাও। পথ আগলে দাঁড়ালো তারা। শরীয়তউল্লাহ্‌র চলার পথ। কারণ তিনি জমিদারদের জুলুমের পাতাগুলোও ছিঁড়তে শুরু করেছিলেন। এক এক করে। তিনি কৃষকের বন্ধু। গরীবের বন্ধু। তাছাড়া তাঁর সব শাগরেদও ছিলো তারাই। কি হিন্দু-কি মুসলমান। আসলে মুসলমানের ধর্মের হুকুমও এই। গরীবের পাশে দাঁড়াও। তাকে সাহায্য কর। সহযোগিতা কর। জুলুমবাজের দুর্গ গুঁড়া কর। ছলে বলে কৌশলে। শরীয়তউল্লাহ্ সে হুকুমই পালন করছিলেন। তাদের হয়ে কথা বলছিলেন। এই তাঁর অপরাধ। ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়লেন তিনি। তাঁকে পুলিশের হেফাজতে নেয়া হলো। তবে বেশি সময় আটকে রাখা গেল না। সময় তখন আঠার'শ একত্রিশ সাল।

জমিদাররা দাড়ির উপর আড়াই টাকা হারে কর বসালো। পূজা-পার্বনে চাঁদা দিতে বাধ্য করলো মুসলমান প্রজাদের। গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করলো। অনেককে মারধোর করলো অযথা। শস্য-জমি বেদখল দিলো। অবশ্য এ কুরবানী নিয়ে খট্‌মট্ লাগা ছিলো আগে থেকেই। জমিদারদের সাথে। হিন্দুদের সাথে। বিশেষ করে ধনী হিন্দুদের সাথে। আরো নানা রকম অত্যাচার জমিদাররা আবিষ্কার করলো। ফরায়েজীরাই জমিদারদের শেণ নজরে পড়লো বেশি বেশি। এসব

www.pathagar.com

করলে কার না জেদ লাগে। শরীয়তউল্লাহ্‌র জেদের নদীতেও ঢেউ উঠলো। প্রচণ্ড ঢেউ। তিনি কর দিতে নিষেধ করলেন। চাঁদা দিতে নিষেধ করলেন। আর ঘটা করে গরু জবাই করলেন নিজেই। এখানে-সেখানে। এতে বিরোধের আগুন আরো লাল হলো। শাসক ইংরেজও কান খাড়া করলো। জমিদাররা বুঝলো বেটা ধর্মের কথা বললে কি হবে- রাজনীতির প্যাঁচ খেলছে। ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াতে চায়। হুঁশিয়ার হও, না হলে বিপদ।

এ কান কথায় কাজ হলো। ইংরেজ-দেশের শাসকও যোগ দিলো দুষ্ঠু জমিদারদের সাথে। সবখানে শত্রু। ডাইনেও শত্রু। বাঁয়েও শত্রু। নয়াবাড়িতে আর টিকা গেল না। ছাড়তে হলো। ফিরে এলেন ফরিদপুর।

ফরিদপুর এসেও বসে থাকলেন না। আন্দোলনের চাকা আরো জোরে জোরে ঘুরালেন। শিষ্য-শাগরেদদের ডাকলেন। বুঝালেন। ধর্মের কথা। সংসারের কথা। দেশের কথা। জমিদার-নীলকর সাহেবদের কথা। আর আদেশ করলেন যুদ্ধের। লড়াইয়ের। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। অধর্মের বিরুদ্ধে। দুশমনের বিরুদ্ধে।

এক কথায় ইসলামের নিয়ম-কানুনগুলো ঠিকঠাকভাবে পালনের আদেশ করলেন তিনি। কারণ মুসলমানের কাছে কর্মও যা, ধর্মও তা। দাঁতের সাথে মাটির যেমন মিল। একটি ছাড়া অন্যটি অচল। আর শরীয়তউল্লাহ্‌র আন্দোলন ছিলো ধর্মেরও, কর্মেরও। যা-তিনি শিখেছিলেন বই-পত্রের পাতা ঘাঁটা-ঘাটি করে। দেশ-বিদেশ করে। বড় কথা- কুরআন-হাদীস পড়ে।

আর কতো। পায়ে হাঁটলেন সারা দেশ। বাংলার মুসলমানকে শিখালেন-কি তার ধর্ম। কি তার পরিচয়। আর কি করে এ পরিচয়ের ফলক গেঁথে রাখা যায় শরীরে। মনে। ঘরের দরজায়। জানালায়।

কাজের ধকল তাঁর শরীর কমজোর করে দিচ্ছিলো। এতে অসুখ করলো তাঁর। হৃদয়ের ধুক ধুক শব্দ থামিয়ে দিলো এক সময়। এ

www.pathagar.com

অসুখ। হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ইন্‌তেকাল করলেন। মাত্র ঊনষাট বছর বয়সে। সময়ের দোলনায় তখন আঠার শ' চল্লিশ সাল। তাঁকে দাফন করা হলো বাড়ির উঠানে। পুরান বাড়ি শামাইলে। যে গ্রামে তাঁর জন্ম। মরণের পরও ফিরে গেলেন সে গ্রামেই। সে মাটিতেই পিঠ রাখলেন আবার। অবশ্য সে কবর আর নেই। গিলে খেয়েছে রাক্ষুসে আড়িয়াল খাঁ। সেখানে এখন থই থই পানি।

হাজী শরীয়তউল্লাহ্ ইন্‌তেকাল করেছেন শ'দেড়েক বছর আগে। কিন্তু সাত রাজার ধন মানিকের মতোই তিনি জ্বলছেন আজো। আগামীতেও জ্বলবেন এমনি করে। আমরাও কি হাঁটতে পারি না হাজী শরীয়তউল্লাহ্‌র দেখানো সড়কে? তাঁরই মতো গলার আওয়াজকে বড় করে! কুসংস্কারের বিরুদ্ধে! কুঅভ্যাসের বিরুদ্ধে ! বক-ধার্মিকের পালক ছিঁড়ে-ছুড়ে !

www.pathagar.com

গ্রামের নাম ঘোপ। শহর থেকে মাত্র পাঁচ-ছ মাইল দূরে। বড়সড় গ্রাম। ফুরফুরে উম্ উম্ বাতাস। সোঁদা সোঁদা গন্ধের মাখামাখি। ধানী জমির সবুজ আর সোনালী মাঠ। উধাও আকাশের তলায় মায়া-মমতারা লুটেপুটি খায়। ছল্ ছল্ আওয়াজ করে চলে যায় দড়াটানা নদী।

সোনারোদের ফুলঝুরি

বেশ খানিকটা আলগা হয়ে। সেখান থেকে উঠে আসে হিম্ হিম্ বাতাস। ছড়িয়ে পড়ে ঘোপ গ্রামের প্রতিটি ঘরে। উঠানে। গাছে। পাতার শিরায় শিরায়। কিসিম কিসিম পাখির টান্ টান্ পাখা। শব্দের বাহারি মেলা। মোট কথা, তুলিতে আঁকা যেনো এক নিভাজ গ্রাম ঘোপ।

www.pathagar.com

এই ঘোপ গ্রামেই তাঁর জন্ম। সময় তখন দশই পৌষ বারোশ' আটষট্টি বাংলা। ইংরেজি আঠারো'শ' একষট্টি সাল। আজ থেকে প্রায় সোয়াশ' বছর আগের ব্যাপার। এ সোয়াশ' বছর আগে যিনি এ দুনিয়ার আলো-বাতাসে হেসেছিলেন তাঁর নাম মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্। পরে, আরো পরে তিনি পরিচিত হন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ নামে। কামিনী ফুলের গন্ধের মতো যে নামের সুবাস এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিলো।

তাঁর দু'ঠোঁটের ফাঁক থেকে ঝরে পড়তো সোনালী-রূপালী শব্দ। ফুলঝুরির মতো। হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ তা কুড়িয়ে নিতো। বুকে মাখতো। মুখে মাখতো। জমা রাখতো হৃদয়ে। যে বাক্য অন্ধকারে আলোর রোশনী হয়ে জ্বলতো। সত্যের চেরাগটা আরো লাল হতো। ঘুমিয়ে পড়া মনের সাদা পায়রাটাকে জাগিয়ে তুলতো। উড়াল শেখাতো। বুলি শেখতো।

যশোরের ঘোপ ছিলো মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র নানাদের বাড়ি। নিজ গ্রামের নাম ছাতিয়ানতলা। এ-ও যশোর শহরের কাছাকাছি। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র আদি আত্মীয়স্বজনরা কোথাকার লোক ছিলেন, এ নিয়ে তেমন কোনো খোলামেলা ইতিহাস নেই। তাঁর বংশের প্রথম যে মানুষটি ছাতিয়ান গাছের তলায় জিরিয়েছিলেন, তাঁর নাম মুনায়েম খাঁ। লোকে ডাকতো মানু খাঁ। গ্রামের মাথায় ছিলো ঝাঁকড়া চুলে ঠায় দাঁড়ানো এক আলীশান ছাতিয়ান গাছ। বাকি সব ঝোপঝাড়। মানু খাঁ-ই ঝোপ-জঙ্গল সাফ-সুতর করে আবাদ করেছিলেন পহেলা। তাও সেই মুঘল আমলের শেষ দিককার কথা।

এরপর থেকে সাতপুরুষ পার হলো।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র আব্বা ওয়ারিসউদ্দীন ছিলেন শান্ত ভদ্র মানুষ। দাদা নাসির মামুদও ছিলেন তাই। দেশ-জাতি আর ধর্ম এ তিনটিকে ওয়ারিসউদ্দীন জীবনের মতোই ভালোবাসতেন। আদর

www.pathagar.com

করতেন। ঠিক সে-রকমই ছিলো তাঁর চলাফেরা। ভাব-ভঙ্গি। ছেলে মেহেরউল্লাহ্‌কেও তেমনিভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। স্কুলে ভর্তি করে দিলেন সে আশায়। কিন্তু একটা বিশাল আঁধার দু'জনকে আলাদা করে দিলো। তখন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ প্রাইমারীর ছাত্র। 'বর্ণ পরিচয় শেষ করে 'বোধোদয়'-এ হাত রেখেছেন। এ দু'টি বইয়েরই লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। চলার শুরুতেই পা ভাঙলো তাঁর। মনও। স্কুলের লেখাপড়ার ইতি হলো।

আব্বা নেই। মুরুব্বি বলতে আছেন আম্মা। সংসারও তেমন রমরমা নয়। তবে মামারা ছিলেন ধনী মানুষ। গোয়াল ভরা গরু গোলা ভরা ধান। আর আছে মাঠের পর মাঠ। ফসলি জমি মনের সীমানাও ছিলো তেমনি অনেক বড়ো। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ তাদের আদর-যত্নেই মক্তবের শীতল পাটিতে বেশ কিছু সময় আটকাতে পেরেছিলেন নিজেকে। আরবী-ফারসী আর উর্দু তাঁর সারা জীবনের সাথী হয়েছিলো সেখান থেকেই। সরষে ফুলের মতো সতেজ যখন তাঁর জীবনের দিনগুলো, তখন সে সব কাজে লাগিয়েছেন। কখনো ঢাল, কখনো তরবারি, আবার কখনো শাণিত বর্শা হিসাবে; যা শত্রুর কলিজা ফালা ফালা করে দিতো। ফালা ফালা করে দিতো অসত্যের হৃৎপিণ্ড। কাছে টানতো দুশমন। আপন করে নিতো তাদের।

লেখাপড়া তেমন বেশি এগুলো না। নিয়ম-মাফিক শিক্ষা মক্তবের বাঁশের বেড়াকে ফুটো করে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারলো না। তাতে কি ! নিজে-নিজেই অনেক দামী দামী বই, বড়ো বড়ো বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তিনি। সে সব বইপত্রের পাতা থেকে জ্ঞানের ঝরঝরে কুসুমগুলো মনের থলিতে তুলে রেখেছেন। সাবধানে। যতন করে।

অভাবী সংসার। রুজি-রোজগার দরকার। তা নাহলে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাই মুশকিল। মামাদের আর কতো তকলিফ দেয়া যায়। তাই মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ কাজে হাত দিলেন। নতুন জীবন শুরু করলেন। কর্মজীবন। প্রথমে পা রাখলেন যশোর জেলা বোর্ডের

www.pathagar.com

বারান্দায়। ছোট-খাটো চাকরি। কিন্তু মনের সাথে বুঝ-পরামর্শ করে দেখলেন, এ চাকরি তার করা হবে না। এতে শির উঁচু করে চলা যায় না। কথা বলা যায় না নিজের মতো করে। কেবল হুকুম মানতে হবে। অন্যের হুকুম শুনতে হবে। দু'চার দিন পরই ইস্তফা দিলেন। ফুরফুরে বাতাসে মন আর শরীর ডুবিয়ে দিলেন। ভাসিয়ে দিলেন আবার। এখন কারো আদেশ নেই। নিষেধ নেই। এ ভুবনে নিজেই রাজা।

কিন্তু এখন কি করা যায়! হেসে খেলে তো আর সব সময় দিন চলে না! একটা কিছু করা প্রয়োজন। ঠিক করলেন আর কোনো চাকরি নয়। চাই স্বাধীন কাজ। সেখানে অন্যের হুকুমদারি নেই। খবরদারি নেই।

তাই করলেন। কাপড় কাটা কাজ শেখায় মন দিলেন। পোশাক-আশাক তৈরির কাজ। তখন মুসলমানদের একক ব্যবসা ছিলো এটি। এ ব্যবসার নাম দরজিগিরি। ইচ্ছা করলেই তো আর সব কিছু ঝটপট শুরু করা যায় না! কাজের রগ-রেশার খবর নিতে হয়। হদিস নিতে হয় আদি-অন্তের। মেহেরউল্লাহ্ উস্তাদ ধরলেন। খড়কি গ্রামের জাহাঁ বখ্শ দরজি তাঁর উস্তাদ। তখন দরজি হিসেবে জাহাঁ বখ্শের খুব নামডাক। তাঁর ব্যবসার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। ইংরেজদের সাথেও ওঠাবসা। চলাফেরা। যেমনি উস্তাদ-তেমনি শাগরেদ। দরজিগিরির কায়দা-কানুন জমা করে নিলেন মনে, মগজেও। খুব সহজেই। কম সময়ে।

প্রথমে দোকান খুললেন খোজাহাট গ্রামে। তারপর শহরে। যশোরের দড়াটানা রোডে। বাজার মতো এলাকা। উস্তাদ জাহাঁ বখ্শের মতো মেহেরউল্লাহ্র নামের গন্ধও বাতাসে উড়তে লাগলো। এতে ব্যবসাও জমে উঠলো। এভাবে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন। এ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শেই মেহেরউল্লাহ দাজিলিং-এ দোকান খুলেছিলেন। দার্জিলিং এলাকাটা এখন ভারতের অংশ। হিমালয় পর্বতের ঠিক পাশেই। দোকানের কপাট বেশিক্ষণ খোলা রাখতে পারেন নি সেখানে। চলে এসেছিলেন যশোরে। মন-শরীর

www.pathagar.com

কোনোটাই ঠিকঠাক যাচ্ছিলো না তাঁর, বিদেশ বিভুঁইয়ে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলেন। আবার দড়াটানা রোডে।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ ভালো দরজি ছিলেন, এ জন্যেই তাঁর এতো নাম-ডাক, তা কিন্তু নয়। আসলে তিনি ছিলেন এদেশের মানুষের আপনজন। বিপদের বন্ধু। অসহায় মানুষের আশা-ভরসা। আপন ধর্মের জন্যে জান-কুরবান মানুষ মেহেরউল্লাহ্। এজন্যে জীবনও কুরবানী করেছিলেন শেষ-মেশ। তাই তিনি এখন ইতিহাস। মানুষের মুখে মুখে। বুকে বুকে। তাঁর পরিচয়ের সীমানা আজও এতো বড়ো।

যে সময়ের কথা, তখন ইংরেজ এদেশের মালিক। তাদের কথায় যখন উঠতে হয়, বসতে হয়, চলতেও হয়; তখন মালিক না বলে আর কি বলা যায়! ছলচাতুরি করে এদেশের মালিকানা হাত করেছিলো তারা।

ইংরেজরা ছিলো বণিক। ব্যবসা করতে এসেছিলো এদেশে। কিন্তু মিথ্যার মিশকালো পথে হাঁটাহাটি করে দেশটাই কিনে ফেললো একদিন। এ কাজে দুষ্ঠু ইংরেজের যারা দোস্ত বনেছিলো, তারা এ মাটিরই মানুষ। তবে সংখ্যায় ছিলো খুবই কম। ইতিহাস যাদের নাম রেখেছে বিশ্বাস-ঘাতক। দেশের মানুষের দুশমন। মোটকথা, স্বাধীনতার দুশমন।

গোটা ষাট-পয়ষট্টি বছর পেছনে হাঁটলেই সে সব দিনগুলোর কাছে পৌঁছা যায়। আঁধারে ঢাকা সেই দিনগুলোর কাছে। তখন ইংরেজ শাসনের শেষ অবস্থা। যাই-যাই করছে তারা। ভাটা পড়েছে হুঙ্কারে। দাপটেও। নিবু নিবু চোখের জ্যোতি। সাহসের হাড্ডি-গোশতে অসুখ-বিসুখ। ভয় আর অনুশোচনার ঘুণ কুট কুট করে কাটছে কলিজা, গোর্দা, দিল্।

আরো আগে। কয়েকশ' বছর আগে। যখন ইংরেজ বণিকরা আনাগোনা করতো। ঘাটে ঘাটে জাহাজ ভিড়াতো। পালতোলা জাহাজ। তখন তারা কেবল মালপত্রই বোঝাই করে আনতো না জাহাজে।

www.pathagar.com

পোটলা-পুটলির ফাঁক-ফোকড়ে থাকতো শ'এ শ'এ পাদ্‌রি। এ পাদ্‌রিদের কাজ ছিলো ধর্ম প্রচার। ধর্মের নাম খৃস্টধর্ম। ইংরেজ বণিকরা ছিলো ধর্মে খৃস্টান। তাই তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি ধর্ম ব্যবসাও চালিয়ে যেতো। খুব চালাকির জাল বুনে বুনে। মানুষজনদের চোখে-মুখে ধাঁধার ধুলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে। লোভ-লালসার রুমাল উড়িয়ে উড়িয়ে। আবার কখনো ভয়ের লাল চোখ উদাম করে।

মধুসুদন দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মস্ত বড় কবি। সবচেয়ে বড় কবি। মহাকাব্য ' মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁর বিখ্যাত বই। তিনি ধর্মে ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। প্রতিভার ঝলঝলে চোখ ছিলো তাঁর। পাদরিরা লোভ লালসায় ফেলে তাঁকে খৃস্টান বানিয়ে ফেললো। পরে তাঁর নাম হয়েছিলো মাইকেল মধুসুদন দত্ত। ধর্মপ্রাচারের কায়দা-কানুন যখন এমন, তখন একে ব্যবসা ছাড়া আমরা আর কি বলি?

আর একজন শেখ জমিরউদ্দীন। জ্ঞানগরিমার কমতি নেই। কলমেও ধার আছে। বেশ কিছু বইপত্র লিখেছেন তিনি। কথা বলতে পারেন ভালো। সুন্দর সুন্দর বাক্যে। প্যাঁচালো ঘোরালো শব্দে। মোটকথা ওজনদার মানুষ তিনি। পাদরিদের নজর পড়লো তাঁর উপর। ইনিয়ে-বিনয়ে শত কথা বুঝালো তাঁকে। লোভের ফুটফুটে রুমাল তো আছেই। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ভুল আর মিথ্যা ফর্দ পেশ করে করে জমিরউদ্দীনের কান ভারী করলো। মনও। এমনকি দুষ্ঠু পাদরিরা আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন নিয়েও ওলট-পালট ধারণা দিলো তাঁকে।

শেখ জমিরউদ্দীন পাদরিদের ধোঁকায় পড়লেন। তিনি ভাবলেন, পাদ্‌রিদের কথাই বুঝি ঠিক। পুরানো বিশ্বাসের দেয়ালটা ভেঙে পড়লো। একদিন দেখা গেলো শখে জমিরউদ্দীন আর শেখ জমির উদ্দীন নেই। রেভারেণ্ড জন জমিরউদ্দীন হয়ে গেছেন তিনি। একেবারে খৃস্টান পাদ্‌রি। পরে অবশ্য পাদ্‌রিদের টোপ উগলে ফেলেছিলেন। আবার ফিরে এসেছিলেন আপন ঘরে। সুবোধ বালকের মতো। তাঁর

www.pathagar.com

মনের ঘোর কেটে গিয়েছিলো। তিনি সত্যকে চিনতে পেরেছিলেন আবার। তবে তা মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র চেষ্টা তদবীরের পর। অনেক লেখালেখি, অনেক কথার লড়াই, অনেক যুক্তিতর্ক। তারপর জন জমিরউদ্দীনের মেঘলা আকাশে সত্যের সুরুজ উঁকি দিয়েছিলো। হু হু করে হেসেছিলো। ইসলাম প্রচারক হিসেবে তাঁরও নাম হয়েছিলো মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র মতো।

শেখ জমিরউদ্দীন একজন সাথী হিসেবেই পাশাপাশি হেঁটেছেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র। আপন ভাইয়ের মতো। আজীবন।

শেখ জমিরউদ্দীন ছিলেন কুষ্টিয়ার মেহেরপুর অঞ্চলের মানুষ। জন্মেছিলেন আঠারো শ' সত্তুর ইংরেজীতে। গোড়াডোব তার গ্রামের নাম। ইনতেকাল করেন উনিশ শ' সাঁইতিরিশ সালের পনেরোই আগস্ট। তখন বাংলা তেরশ' চুয়াল্লিশ সাল।

পাদ্‌রিরা হাঁটাহাঁটি করে। বলাবলি করে। গ্রামে-গঞ্জে হাটে-মাঠে তাদের আনাগোনা। সভা-সমিতি করে মানুষজনদের কাছে খৃস্ট ধর্মের কথা পৌঁছায়। হ্যাঁ, যার যার ধর্মের কথা বললে তেমন দোষের কি! কিন্তু পাদরিরা ছিলো অন্য স্বভাবের। তারা তা করতো না। নিজের কথা বলতে গিয়ে অন্যকে গালাগাল করতো। মিথ্যা বানানো কিসসা-কাহিনী বলে অন্য ধর্মকে খাটো করতো। মানুষজনদের চোখে ধাঁধার চশমা লাগিয়ে দিতো। ধাঁধার ঘোর যাদের ভেড়া বানিয়ে ফেলতো, তারাই পাদ্‌রিদের কাঁটাওয়ালা টোপ গিলে ফেলতো। টুপ করে।

ইসলাম ধর্ম ছিলো তাদের বড় বাধা। তাই এর উপরই ছিলো পাদরিদের যতো রিশ। আজগুবি গল্প আর বানানো মিথ্যা দলিল পথে-ঘাটে টাঙিয়ে রাখতো পাদরিরা। এতে অনেক মুসলমানই ধোঁকায় পড়তো।

এর একটা কারণও ছিলো। শিক্ষায়-দীক্ষায় মুসলমানেরা ছিলো অনেক পেছনে। ইংরেজ শাসকদের কুনজরে পড়েছিলো তারা। তাই

www.pathagar.com

বই-পত্রের সাথে তাদের তেমন কোনো মাখামাখি ছিলো না। অশিক্ষা-কুশিক্ষা সব সময় তাদের পাশাপাশি হাঁটাহাঁটি করতো। বিদ্যা নেই, যে জন্যে বুদ্ধির চোখও ঘোলাটে। ঘোলা চোখে কতোটাই বা আর ঠিকঠাক দেখা যায়!

ধর্ম-অধর্মের ব্যাপারেও একই হাল। বিদ্যা নেই, বুদ্ধিও কম। তাই এসব নিয়ে তেমন কোনো ফিসফাস নেই। পড়া শোনা নেই। বাপ-দাদাদের মুখ থেকে যা কানে এসেছে, এ পর্যন্তই শেষ। এর বাইরে গেলেই চোখ বড়ো বড়ো হয়ে আসতো। কাঁপন আসতো বুকে। যে যা বুঝাতো তা'ই বিশ্বাস করতো। ঠিক মনে করতো। বেশির ভাগ বাঙালী মুসলমানেরই ছিলো এই দশা। দু-একজন বাদে। এটাই ছিলো পাদ্‌রিদের মহাসুযোগ। এ সুযোগ বেহাত করে নি চালাক পাদরিরা।

দড়াটানা রোডেও পাদ্‌রিরা সভা করে। গলাবাজি করে। লোভ-লালসার গন্ধমাখা রুমাল ওড়ায় বাতাসে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ডাহা-বাজে কথা বলাবলি করে। মিথ্যা মনগড়া নানা কথা বলে গ্রামের লোকজনদের বোকা বানায়। ধোঁকায় ফেলে। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস করে না। সাহসের বেলুন চুপসে আসে। কারণ পাদ্‌রিরা সাদা চামড়ার মানুষ। রাজার জাত। তাদের বিরুদ্ধে কি কথা বলা যায়? অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কে কথা বলবে? কার এতো বুকের পাটা? ঈমানের জোর?

মেহেরউল্লাহ্ কাপড় কাটতে কাটতে কান খাড়া করেন। পাদরিদের কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন। প্রায় প্রতি হাটবারেই তারা আসে। একই কথা। বলার কায়দা-কৌশলও এক। নিজের ধর্ম প্রচার করতে এসে অন্যকে গালাগাল শুধু গালাগালই নয়, সাথে মিথ্যা অপবাদও।

এ কেমন ব্যাপার! এ-সব মিথ্যার জবাব দেয়া প্রয়োজন। কড়া জবাব। কাপড়-কাঁচি রেখে তৈরি হলেন মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্।

ঈমানের দরিয়ায় সাহসের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে তাঁর। চোখ-কান বন্ধ রাখার অর্থ বিশ্বাসের সাথে বেঈমানি করা। নিজের সাথে

www.pathagar.com

বেঈমানি। শুরুতে একাই নেমেছিলেন লড়াইয়ে। পাদ্‌রিদের সভার পাশাপাশি তিনিও সভা ডাকতেন। কথার খৈ ফুটাতেন মুখে। জবাব দিতেন প্রতিটি মিথ্যার। সঠিক জবাব। সত্যের কুড়াল দিয়ে কাটতেন মিথ্যার ডাল-পালা। লতা-পাতা।

মেহেরউল্লাহ্ বুঝলেন, এভাবে আর চলে না। যদিও কয়েকজন সঙ্গী-সাথী তাঁর পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেন এরই মাঝে। -পাদ্‌রিদের সাথে টক্কর দিতে হলে কিন্তু আরো জানাশোনা দরকার। পড়ালেখা দরকার। তাঁর জ্ঞানের ঘরকে আরো বড়ো করা চাই। আরো উঁচু করা চাই। কারণ পাদ্‌রিরা সবাই শিক্ষিত। পড়ালেখা জানা মানুষ। তাই মূন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌ও লেখাপড়ায় মন দিলেন। পড়লেনও অনেক। দড়াটানা রোডের দোকানে বসে বসেই। কুরআন-হাদীস আর ধর্ম বিষয়ে বড়ো বড়ো বই-এর প্রতিটি হরফের সাথে কথা বললেন, রাত জেগে জেগে। জ্ঞানের মণি-মুক্তাগুলো তুলে নিলেন সেখান থেকে। বুঝ-পরামর্শ নিলেন মুরুব্বিদের। পণ্ডিতদের। যারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভালো জানেন। ভালো বোঝেন।

মোটকথা, দড়াটানা রোডের ছোট্ট দোকানটিতে অন্য রকম আবহাওয়া। নামী-দামী লোকজনেরা আনাগোনা করেন এখানে। রাতের পর রাত দিনের পর দিন চলে আলোচনা। সমালোচনা। ধর্ম থেকে শুরু করে সাহিত্যের সবুজ পাতাগুলোও উলটে-পালটে দেখেন তাঁরা। আদান-প্রাদন করেন এখানে। বুঝশপরামর্শ হয় পাদ্‌রিদের খপ্পর থেকে কি করে বাঁচানো যায় অসহায় মুসলমানদের। এদেশের মানুষজনদের।

এরপর। যখন বুকের ছাতিতে শক্ত হয়েছে সাহসের হাড়, বড়ো হয়েছে জানাশোনার ঘর, তখন আবার তিনি লড়াইয়ে নামলেন জোরেশোরে। যুক্তিতর্কের লড়াই। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের লড়াই। তাই বলে এতোদিন কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি তিনি। যেখানেই পাদরিরা ভাঁওতাবাজির লিষ্টি নিয়ে হাজির হয়েছে, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌ও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন সেখানেই। মোকাবিলা

www.pathagar.com

করেছেন। নাস্তনাবুদ করে দিয়েছেন তাদের। ভেঙ্গে দিয়েছেন সব আয়োজন। এভাবে তরতাজা রেখেছেন মুসলমানদের ঈমান। মন। শরীর। জমা করেছেন সাহস।

এর পাশাপাশিই চলছিলো জ্ঞানের বাগানে হাঁটাহাঁটি।

পাদ্‌রিদের কুটকৌশলের শেষ ছিলো না। যে করেই হোক মুসলমানদের বিশ্বাসকে বিগড়ে দিতে হবে। ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তবেই তো কেল্লা ফতে। তাই তারা বানানো গালগপ্পো পত্রিকায় লিখতো। ইসলামের সোনালী পালকগুলো নিয়ে নানান প্রশ্ন তুলতো। যা ছিলো মিথ্যা মনগড়া। এমনকি, নবী-রসূল নিয়েও তারা বেফাঁস কথা লিখতো। বেয়াদবি করতো। তাদের এমনি একটি পত্রিকার নাম 'খৃস্টীয় বান্ধব'। যার পাতাগুলো নর্দমার কীটের মতো কিলবিল করতো অন্যায় আর অসত্যের কালচে হরফে।

এসব দেখে-শুনে কতোই বা আর মেজাজ ঠিক রাখা যায়! সহ্য করা যায়!

মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন নি। তাই কলমের নিবকে বর্শার ফলা করে বাগিয়ে ধরেছিলেন। সভা-সমিতি তো আছেই -যুক্তির ঝকমকে বাক্যগুলো সেখানে ঝড় তুলতো। পাদ্‌রিদের চোখে আঁধার নেমে আসতো। কলমের ধারও ছিলো তেমনি। অনেক ওজনদার লেখাই ছাপা হয়েছিলো তখন মেহেরউল্লাহ্‌র। সে সময়কার পত্র-পত্রিকার পাতাগুলো এর সাক্ষী। খৃস্টান পাদ্‌রিদের প্রতিটি লেখারই জবাব দিয়েছিলেন তিনি। পালটা লেখা দিয়ে দাঁত উপড়ে ফেলে এমনি জবাব।

তাঁর লেখায় অনেকের চোখের ঘোরই কেটে গিয়েছিলো। মনের সংশয়ও। শেখ জমিরউদ্দীনের মতো।

শেখ জমিরউদ্দীন যখন খৃস্টান পাদরিদের চাপিয়ে দেয়া চিন্তাভাবনা মনের মাঝে পুষতেন, তখন লিখেছিলেন 'আসল কুরআন কোথায়'। ছাপা হয়েছিলো 'খৃস্টীয় বান্ধব' পত্রিকায়। মেহেরউল্লাহ্‌ জবাবে

www.pathagar.com

লিখেছিলেন আসল কুরআন সর্বত্র'। তিনি লিখেছিলেন 'সুধাকর' পত্রিকায়। 'সুধাকর' পত্রিকাটি ছিলো সে সময়কার একটি নামী পত্রিকা। যার সম্পাদক ছিলেন মোহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ ও পরবর্তী সময়ে শেখ আবদুর রহীম। মেহেরউল্লাহ্ আর শেখ জমিরউদ্দীনের এ কলম-যুদ্ধ সময়ের বেশ ক'টা পাতাকেই আটকে রেখেছিলো। মেহেরউল্লাহ্র লেখায় ছিলো কুরবানীর চাকুর মতো ধার। সে ধার কেটে দিয়েছিলো শেখ জমিরউদ্দীনের মনের সব ক'টি ঘোলাটে পর্দা।

'রদ্দে খৃস্টান বা খৃস্টান ধর্মের অসারতা' মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম। ছাপা হয়েছিলো আঠারো শ' ছিয়াশি ইংরেজীতে। সে বই খৃস্টান পাদ্রিদের ধর্ম ব্যবসার বারোটা বাজিয়েছিলো। পথে বসিয়েছিলো। কারণ তাদের সব জারিজুরি ফাঁস করে দেয়া হয়েছিলো এ বইয়ে। ছবির মতো করে।

'মেহেরুল এসলাম', 'বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভাণ্ডার', 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং 'জোওয়াবুন্নাছারা বা খৃস্টানদের প্রশ্নোত্তর' ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য বইয়ের নাম।

জীবনে অনেক সভা করেছেন তিনি। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছেন। শহরের পর শহরে গেছেন। সত্যের সাদা পায়রাগুলো মানুষজনদের মনের খাঁচায় রেখে এসেছেন। পাদ্রিদের ভণ্ডামির রঙিন পাতিলগুলো টুক করে ফাটিয়ে দিয়েছেন হাতের লাঠির ঠোকায়। হাজার হাজার মানুষ তখন ফেলতো স্বস্তির নিঃশ্বাস। আর পালিয়ে জান বাঁচাতো পাদ্রিরা। এমন অনেকবারই হয়েছে।

পাদ্রি মনরো তো মুন্সী মেহেরউল্লাহ্র নাম শুনেই পালিয়ে গিয়াছিলো। ওয়াদা করেও তাঁর মুখোমুখি হতে সাহস করে নি। কি করে করবে! তার যে তেমন তাকত নেই বুকের মাঝখানটায়। গতরে জড়নো আলখেল্লাটাই যে মনরোর সম্বল। তার ভেতর লুকিয়ে রাখতো যতো সব বদ্ বুদ্ধি।

www.pathagar.com

রানাঘাট ছিলো পাদ্‌রি মনরোর ঘাঁটি। রানাঘাট এলাকাটা এখন হিন্দুস্থানে পড়েছে। হাসপাতাল আর দাতব্য চিকিৎসালয় তার শিকার ধরার ফাঁদ। এটা পাদ্‌রিদের অনেকগুলো কূট-কৌশলের একটি। এলাকায় ভালো মানুষ সেজে অশিক্ষিত মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করতো তারা। কুপরামর্শ দিয়ে দিয়ে তাদেরকে খৃস্টান বানাতো। লোভের ফাঁদে ফেলে আল্লাহ্‌র রহম থেকে দূরে সরিয়ে নিতো। পাদ্‌রি মনরো এসব করতো তাদের গরীবীর সুযোগ নিয়ে।

আসলে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌ ছিলেন দুষ্টু পাদ্‌রিদের জন্যে ভয়ের একটা গনগনে সুরুজ। যার উত্তাপে সব মিথ্যা আর ভণ্ডামি পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। ছাই হবে না কেন? মিথ্যার জীবন আর কতো সময় ! এক-দুই বড়জোর তিন দিন ! তারপরই তো আয়ূ শেষ হতে বাধ্য। তাই পাদরিরা তাঁর নাম শুনলেই ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতো।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌ কিন্তু তেমন কোনো বড়সড় জোয়ান ছিলেন না। হাতের পেশিতেও ছিলো না তেমন কোনো তাকত। তবে তাঁর সব শক্তির আড্ডাখানা ছিলো মনে। সেখানে বসবাস করতো আল্লাহ্‌র কথার। আল্লাহ্‌র আদেশ আর নিষেধেরা। এ'ই ছিলো তাঁর একমাত্র পুঁজি। লড়াইয়ে জিতবার গোলাবারুদ।

পুঁজি ভালো। তাই সাহসের নিশান পত্‌পত্‌ করে ওড়ে। গোলার আঘাত দুশমনের দুর্গ গুঁড়িয়ে দেয়। ইট-বালু সরিয়ে ফেলে। ভেঙে দেয় তাদের মনের ঘরও। লড়াইয়ে কোনো সময় হেরে গেছেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌ এমন নজির নেই। সবগুলো সভায়ই পাদ্‌রিদের গলায় ঝুলতো পরাজয়ের সাইনবোর্ড। শরমের লাল লিষ্টি। তাদের কূট-কৌশলের বিশাল জাল টুটাফাটা করে দিতেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌ তাঁর সত্যের চকচকে তরবারির খোঁচায়। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি আর কথা বলার কায়দা-কানুন দুষ্টু পাদ্‌রিদের প্রায়ই বিপদে ফেলতো।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌র জীবনের এমনি একটি ঘটনাঃ

www.pathagar.com

পাদ্‌রিরা আর মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌ মুখোমুখি হয়েছেন এক বিশাল সভায়। প্রশ্ন-উত্তরের সভা। জবাব না দিতে পারলেই হার। কেবল হারই নয়, শরমেরও একশেষ। কারণ শত শত মানুষ হাজির থাকতো এ-সব সভায়। শুরু হলো তর্কযুদ্ধ। পাদ্‌রিই প্রথম তীর ছুঁড়লো মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌কে নিশানা করে। কিন্তু মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র বাগিয়ে ধরা ঢালে হোঁচট খেয়ে পাদরির ছুঁড়ে মারা তীর গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

পাদ্‌রি -কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসই তো আপনার ধর্মের সম্বল। বিজ্ঞানের যুগে এ-সবের কি কোনো মূল্য আছে?

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌-কি বলতে চান, খোলামেলাভাবে বলুন।

পাদ্‌রি- আপনাদের তো ফুঁটু-এ বিশ্বাস খুব।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌ -ফুঁটু-এ বিশ্বাস? কি রকম?

পাদ্‌রি-এই যেমন পানি পড়া, তাবিজ-কবজ আর যতোসব তাক-তুকে আপনাদের অগাধ ঈমান। বিজ্ঞানের যুগে এগুলোর পেছনে কোনো যুক্তিই নেই। এ সবে আবার রোগ-ব্যাধি সারে কি করে?

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌- বেয়াদব কোথাকার? কি বললি? এই, কে আছিস ধর পাদ্‌রি ব্যাটাকে ....। (মুন্সীর চেহারায় তখন নকল গোস্বার খেলা।)

পাদ্‌রি ভাবতে পারে নি মুন্সী মেহেরউলাহ্‌ তার সাথে এমন ব্যবহার করবেন। কারণ পাদ্‌রিরা জানতো, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র ওজন। স্বভাবের চেহারা। তাই আজকের এ ব্যবহারে পাদ্‌রি বেশ অপমান বোধ করলো। তাছাড়া সভা ভর্তি মানুষ। রাগে গজগজ করতে করতে চলে যাচ্ছিলো পাদ্‌রি। মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌ তার পথ আগলে দাঁড়ালেন। তাঁর দুঠোঁটের ফাঁক থেকে হাসির ঝিলিক বেরিয়ে এলো। বললেন- কি পাদ্‌রি সাহেব, আমার কথায় দুঃখ পেয়েছেন? দিলে চোট লেগেছে?

www.pathagar.com

আপনার মতো মানুষের কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমি আশা করি নি। চোট লাগা তো স্বাভাবিক। আপনারও লাগতো। জবাব দিলো পাদ্‌রি।

এুন্সী মেহেরউল্লাহ্- বলেন কি? এতোটুকু কথার এতো চোট ! এতেই পালাবার জন্যে আপনার এতো তাড়া! এতো লাফালাফি ! এখন ভাবুন দেখি, যিনি আল্লাহ্- সব শক্তির মুল, তাঁর নাম কালাম নিয়ে যখন কোনো রোগীর শরীরে ফু' দেই, রোগ কেন রোগের বাপকেও তো তখন পালাতে হয়। অথচ আপনিই কিনা বলছেন এটা আমাদের কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস?

কথা শুনে পাদ্‌রির চোখ তখন বুজে এসেছে। পরাজয়ের সাইনবোর্ড অজান্তেই ঝুলিয়ে নিয়েছে গলায় এই বলে যে 'কথার শক্তি আছে।'

এমন মজার মজার ঘঁনা অনেকই ঘটেছে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌র জীবনে। এগুলো সব জমা করলে হয়তো উঁচু হবে পাহাড়ের মতো।

গাদাসিধে মানুষ ছিলেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্। রুজি-রোজগার কম করেন নি। কিন্তু তাঁর বাড়ি ঘরের অবস্থা ছিলো খুবই কাহিল। সংসারেরও। ভাঙ্গা ঘরদোর আর গরীবী লেবাসই ছিলো তাঁর সারা জীবনের সাথী। ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারতেন তিনি। ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকতে পারতেন। কিন্তু সে পথে তিনি পা ফেলেন নি। ঘুমিয়ে থাকা মানুষজনদের দরজায় দরজায় আল্লাহ্‌র কথাকে ঠিকঠাকভাবে পৌঁছিয়ে দেয়াই ছিলো তাঁর কাজ। তা'ই তিনি করেও গেছেন আমরণ। আরামকে হারাম করে।

মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়া ছিলো তাঁর ইচ্ছার গহ্বরাজ। ছাতিয়াতনতলার পাশের গ্রাম মনোহরপুরে এ গন্ধরাজের চারাটি লাগিয়েছিলেন নিজ হাতে। তখন সময় তেরশ' আট বাংলা। ইংরেজি উনিশ শ' এক সাল। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর নামেই তিনি

www.pathagar.com

তাঁর মাদ্রাসার নাম রেখেছিলেন। মওলানা কেরামত আলী জেন্সনপুরী ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম। ইসলাম প্রচারক। এক সময় তিনি বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের সুবাসিত পাপড়িগুলো রেখে গিয়েছিলেন। আজ থেকে প্রায় শ' দুয়েক বছর আগে। তাই মুন্সী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ্ এই মহান ব্যক্তির নামটিই ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মাদ্রাসার গতরে। কেবল মাদ্রাসাই-ই কারামতিয়াই নয়, আরো অনেক মাদ্রাসা-স্কুল মসজিদের জন্যেও তিনি খাটাখাটনি করেছেন। ভালো-মন্দ দেখেছেন। এর জন্যে ভাবনা-চিন্তা করেছেন।

তিনি জানতেন, বাংলার মানুষ যদি জ্ঞানের আলো দিয়ে মনের অন্ধকার ঘরটা ফর্সা করতে পারে, তবেই হবে মিথ্যার মরণ। পাদ্‌রিদের মরণ। এ জন্যে শিক্ষার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিলো বেশি। জ্ঞানের অনেক হীরে-জহরতই তাঁর থলিতে জমা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তা লুকিয়ে রাখেন নি। থলির মুখ সব সময়ই খোলা রেখেছেন। আর বিলিয়েছেন।

তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। নিউমোনিয়া জ্বর হয়েছিলো তাঁর। একদিনে তিন-তিনটি সভা করেছিলেন। বেশি-বেশি খাটাখাটনিই তাঁর কাল হলো। সময় তখন চব্বিশে জ্যৈষ্ঠের শুক্রবার। বাংলা সনের তেরশ' চৌদ্দ। ইংরেজি উনিশ শ' সাত সাল।

তাঁর নিজ গ্রাম ছাতিয়ানতলায়ই দাফন করা হয়েছে তাঁকে। ঘরের ছেলে ঘরেই ঘুমিয়ে আছেন নীরবে।

ইংরেজরা তো গেছে সেই কবে! একেবারে সাত সমুদ্দুরের ওপারে। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌ও আর নেই। তবে পাদ্‌রি মনরোরা কিন্তু এখনো আছে। আরো ভালোভাবে। আরো সুন্দরভাবে। তারা কূট-কৌশলের নতুন নতুন ফাঁদ তৈরি করে আমাদের গ্রামে-গঞ্জে পাহাড়ে-বাদারে হাঁটাহাঁটি করে। পিট্‌পিটে চোখ দিয়ে কেবল সুযোগ হাতড়ে

www.pathagar.com

বেড়ায়। লোভ-লালসার সুতা পথের বাঁকে বাঁকে ফেলে আসে। সে সুতায় জড়িয়ে গিয়ে ঈমান যাচ্ছে অনেকের। কিন্তু তাদের পিটপিটে চোখ ফুটো করে দিতে পারে এমন কেউ আর নেই মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌র মতো।

আমরা কি কেউ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌র পায়ের ছাপ দেখে দেখে হাঁটতে পারি না? তছনছ করে দিতে পারি না পাদ্‌রি মনরোদের সব আয়োজন ? তাদের মিথ্যার জারিজুরি।

www.pathagar.com

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com